প্রথম প্রকাশ :
ব্রেখট জন্মশতবর্ষ : ১৯৫৮

প্রচ্ছদ :
দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : অবিজিৎ কুমাব । প্যাপিবাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০০০৪

মুদ্রক : বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় । ক্রিয়েশন্
৪বি/১বি ড. সুরেশ সরকার বোড । কলকাতা ৭০০ ০১৪

শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে

১৯৩৮–১৯৫৬

থিয়েটারের গান

মুখবন্ধ

কোনো প্রধান কবি একই সঙ্গে নাট্যকাব হিশেবে খ্যাতিমান হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিশ্বসাহিত্যে বিবল হলেও অনুপস্থিত নয়। বের্টোলট ব্রেখটেব ক্ষেত্রে এই সমন্বয় তথাচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমত এই কাবণে যে এই জর্মন কবি সদ্য-কৈশোবোত্তীর্ণ কালেই (১৯১৮) যখন কিছু অসাধাবণ কবিতা লিখে ফেলেছেন, তখন থেকে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁব কাব্যবচনাকে বস্তুত ব্যক্তিগত বিষযেব মতো আড়াল কবেই বেখেছিলেন। তারপবে যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ডিভোশনস' ('হাউসপশটিলে' নামে অধিকতব পবিচিত) জর্মনিতে প্রকাশিত হ'ল (১৯২৭), এবং অচিবেই ক্রমবর্ধমান, শক্তিব প্রতিরুদ্ধতাব ফলে সে-বইটি ভালো ক'বে পাঠকেব হাতে পৌছনোব সময পেল না, ততদিনে ব্রেখট তাঁব প্রথম পর্বেব নাটক 'বাল' (১৯১৮), 'বাতেব দামামা' (১৯১৮-২০) এবং 'শহুবে জঙ্গলে' (১৯২১-২৩) লিখে ফেলেছেন। এই তিনটি নাটকেব প্রথম এবং সফল প্রদর্শনী ১৯২২-২৩ সময়কালে পবপব ঘটে যাবার ফলে ব্রেখটেব নাট্যকার পবিচিতিটিই বড়ো হযে দাঁড়ালো। এবং ১৯৪৫-এব আগে পর্যন্ত জর্মন পাঠকের কাছে ব্রেখটেব ইতিমধ্যে বিশাল কাব্যকীর্তি প্রায় অচেনাই থেকে গিয়েছিল। অনেকে অবশ্য মনে করেন ব্রেখট নিজেই তাঁর কবিখ্যাতিব জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না।

কিন্তু এসবেব ফলে যে-ব্যাপাবটা ব্রেখট-উৎসাহী অনেক মানুষ ঠিকভাবে উপলব্ধি কবার সুযোগ পাননি, সেটা এই যে ব্রেখটের কবিতা এবং নাটক বস্তুত একই সৃজনপ্রক্রিয়ার এপিঠ-ওপিঠ। অর্থাৎ, কবিতাব মাধ্যমে তাঁর যে-ধরনেব বিবর্তমান দ্বান্দ্বিক বস্তুচেতনার সংহত প্রকাশ, নাটকে তিনি তাকেই বিস্তৃততর ও দৃশ্যমান আয়তন দিযেছেন এবং সাধাবণ দর্শক-শ্রোতাব বোধেব আয়ত্তে নিযে গেছেন। সুতরাং একথা বিশেষভাবে বলাব অপেক্ষা বাখে যে ব্রেখটেব কবিতা তাঁর নাটকের সহগামী উপকরণ কিংবা উপাঙ্গবিশেষ নয। ব্রেখটের কবিতার ধারা থেকেই তাঁর নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ। নাট্যবিষয়ে তাঁর বহু-আলোচিত তথা বিতর্কিত তত্ত্বরাশির অনেকটাই মননাশ্রয়ী, যৌক্তিক পশ্চাৎচিন্তা।

বিশের দশকে মার্কসিয় আদর্শে ক্রমদীক্ষিত হবার পাশাপাশি লক্ষ কবা যায ব্রেখটের প্রথম যৌবনের রোমান্টিক গীতিধর্মিতা থেকে তাঁর আপাত-বিশ্লিষ্টতা। এই সংক্রমণকে কবির উপর নিছক সমকালীন রাজনৈতিক প্রভাব হিসেবে দেখাটা কিন্তু ক্ষীণদৃষ্টির পরিচাযক। কারণ ব্রেখটের বিস্ময়কব কাব্যশৈলী—যা তাঁর একান্তই নিজস্ব—তা এই পরিণত পর্যায়েই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং এক প্রবল প্রথাবিরোধী কাব্যঐতিহ্যের

জন্ম দেয়। এই দিক থেকে দূরবর্তী হাইনে-কে তাঁর পূর্বসূরি বলা চলে, যেমন থিয়েটারের প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখনীয় সমকালীন নাট্যব্যক্তিত্ব এরউইন পিসকাটর-কে। এখানে লক্ষ করা দরকার যে, তীক্ষ্ণ রাজনীতি-মনস্কতা এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্যের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও ব্রেখট কোনো বিশেষ সাহিত্যগোষ্ঠী কিংবা নাট্যআন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চাননি। এবং কবিতাকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের তথা দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে নানাভাবে ব্যবহার করা সত্ত্বেও ব্রেখ্‌টের কাছে তাঁর কবিতা ছিল আত্মনগ্নায়নের প্রধানতম আয়ুধ। 'আত্মনগ্নায়ন' বলছি এই কারণে যে প্রথানুগ কবিসুলভ 'আত্মপ্রকাশ'-এর তাগিদ তাঁর ছিল না।

সুতীক্ষ্ণ সমাজবোধ এবং রাজনীতিচেতনার দ্বারা আপন হৃদয় ও মস্তিষ্ককে ব্যাপৃত রেখেও ব্রেখ্‌টের এ-ব্যাপারে সতর্ক সচেতনতা ছিল যে, যে-কোনো আর্টেই বিষয়বস্তু যদি ফর্মের উপরে উঠে গিয়ে তাকে শাসন করে ফেলে—তা বিষয়বস্তুটা স্বদেশপ্রেম কিংবা রাজনীতি হোক অথবা অধ্যাত্ম কিংবা ব্যক্তিগত প্রেমের অভিজ্ঞতাই হোক—তাহলেই আর্টে স্থূলতা (অর্থাৎ vulgarity) আসবে। অর্থাৎ, কোনও সার্থক আর্টই শুধুমাত্র তথাকথিত বিষয়গুণে মহত্ত্ব লাভ করে না, যেমন তা শুধুমাত্র অসচরাচর কিংবা 'অপ্রিয়' বিষয়ের অবতারণার ফলেই নিকৃষ্ট বিবেচিত হতে পারে না। বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনশৈলী সম্পূর্ণতই কবি কিংবা শিল্পীর মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপার, তার ভালো-মন্দ আর্টের নিজের মাপকাঠিতে বিচার করার চেষ্টা বিভ্রান্তিকর এবং নিষ্প্রয়োজন। এই কথাটা বুঝে নিলেই যথেষ্ট যে রাজনৈতিক কিংবা ঐ-জাতীয় ভাবনা এক অর্থে কবির একান্ত ব্যক্তিসত্তার বাইরের জিনিস, যা বহুব্যক্তির সম্মিলিত জীবনের সমস্যা ও বোধকে আশ্রয় ক'রে থাকে। অপর দিকে, ব্যক্তিগত প্রেম—যা চিরাচরিত লিরিকের উৎস—যে-প্রকারেরই হোক না কেন, অনায়াসেই কবির নির্জন কক্ষে অন্তরীণ হতে রাজি হয়। রাজনীতিক-কবির কিংবা সামাজিক-কবির সমস্যাটাই বোধহয় তাহলে এই যে, তিনি এমন একটি বিষয়ে নিমগ্ন যা সেই নির্জন আড়ালে এসে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে না। এই অর্থে নিশ্চয়ই বলা যায় যে, রাজনীতিক-সামাজিক কবিচরিত্র জগতের অন্যতম ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের যন্ত্রণাদীর্ণ জীবন্ত রূপ।

এবং বের্টোল্‌ট ব্রেখট সম্প্রতিকালের এহেন এক জ্বলন্ত উদাহরণ, যিনি তাঁর চমকপ্রদ সৃষ্টির উৎকর্ষের চেয়েও হয়তো এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্বের সমস্যাটির উপর আলোকপাত করার কৃতিত্বেই ইতিহাসে আরো স্থায়ী আসন পাবেন। ব্রেখট দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে পৃথিবীকে চিনবার সময় পেয়েছেন, দ্বিতীয় যুদ্ধে নাৎসী বীভৎসতার অত্যাচারে 'জুতোর পাটির চেয়েও বেশিবার দেশ পাল্‌টাতে পাল্‌টাতে' সংগ্রাম করেছেন, আর যুদ্ধোত্তর পূর্ব জর্মনিতে সাম্যবাদের রূপায়ণের কঠিন পর্যায়ে স্বীয় কাব্যকর্মের তৃপ্তি-অতৃপ্তিতে মহৎ পরিণতি পেয়ে অবশেষে নিজেই ইতিহাস হয়ে গেছেন। তিনি মধ্যবিত্ত সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেটা তাঁর দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই, যদিচ স্পেনের কবি মিগুয়েল হেরনানডেথ (১৯১০-৪২) প্রোলেতারিয় সমাজে জন্মেও ব্রেখটের মতো

অনেক দ্বন্দ্বেই ভুগেছেন এবং শেষ-পর্যন্ত ব্রেখটের তুলনায় তিনি অনেক বেশি কঠোর হয়েছেন জনসাধাবণের সঙ্গে কথোপকথনেব ব্যাপারে। কবি-হেরনানডেথ রাজনীতিক-হেবনানডেথকে শেষ পর্যন্ত অবাধ স্বাধীনতা দিতে বাজি হননি। হয়তো মধ্যবিত্ত শ্রেণীব লোক ব'লে ব্রেখটে যে অপরাধবোধ ও বিবেকদংশন ছিল, হেরনানডেথ, তা থেকে স্বভাবতই মুক্ত থাকতে পেবে কাব্যিক ভারসাম্যের প্রতি বিশুদ্ধ বিবেকে মনঃসংযোগ কবতে পেবেছিলেন। আরেক স্পেনীয় কবির সঙ্গেও ব্রেখটের তুলনা করি। রাফায়েল আলবের্তি (১৯০০) প্রোলেতাবিয় সমাজে জন্মাননি, কাব্যিক অনুশীলনে তাঁব শিক্ষাদীক্ষাও সে-সমাজেব কাছ থেকে পাননি। বাজনীতিক উদ্দেশ্যেব দিক থেকে মায়াকোভস্কি কিংবা ব্রেখটের সঙ্গে তাঁব কোন তফাৎ ছিল না। কিন্তু উক্ত দুই কবিব তুলনায তাঁব পবীক্ষানিরীক্ষায় মানিযে-নেওয়ার পবিমাণ ও দৃষ্টান্ত সামান্য। তাঁর সাফল্যেব অন্তত খানিকটা কাবণ এই যে তিনি কখনো বিশ্বাস করতেন না প্রোলেতারিয় সাহিত্যিক পদ্ধতি ব'লে আলাদা কোন জিনিশ থাকতে পাবে। দুর্ভাগ্যত, ব্রেখটের শিল্পসৃষ্টিতে নিবন্তর বিবেকতাডনা এসে, তিনি যে-সব কর্মে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছেন সেগুলিরই যেন বিশেষভাবে মানহানি ঘটিয়েছে এবং তাঁব ঈপ্সিত ফল থেকে প্রাযশই তাঁকে বঞ্চিত কবেছে। এই বিষণ্ণ অভিজ্ঞতায তাঁর তুলনা সবচেয়ে বেশি মেলে বোধহয় মায়াকোভস্কিতে, যদিও রুশ কবির জীবনের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং তাঁর কাব্য-প্রচেষ্টাব বিভ্রান্তি থেকে ব্রেখট নিশ্চযই প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

ব্রেখটের রক্তে ছিল লিবিক। নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, শুধু লিরিকধর্মী কবিতা রচনা করে গেলেও তিনি বিখ্যাত হযে থাকতেন। কিন্তু তাঁব প্রচণ্ড উদার সীরিয়সনেস তাঁকে সেই নিশ্চিত খ্যাতির মসৃণ জগতে আটকে বাখতে পারেনি। কবিতার সমকালীন প্রবাহে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাব বহুপূজিত বেদীতে তাই তিনি কোন গচ্ছিতলগ্নী না-রেখে, আপন বিবেকেব মন্দিরে আত্মদান করে ইতিহাস-শুদ্ধ হতে চেযেছিলেন। অ্যান্টি-ইনডিভিডুআলিজম তাঁর কাছে তাই বৈশিষ্ট্যের চটক নয়, নৈরাজ্যবাদী-সংশয়বাদী দাযিত্বজ্ঞানহীনতাও নয়। আর ব্রেখট তাঁব সময়কার কবিদের তুলনায় মানুষ-হিসেবে এত বেশি সাবালক ছিলেন যে সেটাই হয়তো তাঁর কবিকৃতির পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে ধ্বংসকারী হযেছে। তাব উপর তিনি চেযেছেন কবিতার পাঠককে তথা নাটকের দর্শককে সাবালক করে তুলতে। শেষোক্ত প্রচেষ্টায় তাচ্ছিল্য করতে হযেছে স্বয়ং অ্যারিসটটলকে পর্যন্ত, যদিও ব্রেখটের আগেও জর্মন সংস্কৃতিতে সাধারণভাবে অ্যারিসটট্ল-পদ্ধতির বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়েছিল গ্যেটে, শিলের প্রমুখ ক্লাসিক প্রতিভার দৃষ্টিভঙ্গিতে। অবশ্য তা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

এসব ব্রেখটের সামান্য কীর্তি নয়। এবং, শুধুমাত্র তাঁর আর্টের থিওরির উপাদান হিসেবে তিনি যে চৈনিক অভিনয়প্রথা ও ন্যাসের (Gestisch) প্রবর্তন করলেন, তাও ব্রেখটের প্রতিভার অসামান্য নিজস্বতা। কিন্তু তিনি ইসকুলমাস্টারি (didactic) ধরণে যে-সব কবিতা (এবং নাটক) সৃষ্টি (ও পরিবেষণ) করেছিলেন, তার তুলনায় তাঁর তির্যক

অথচ সমবেদনাময় কবিতাগুলিই অধিকতর রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

তাই তাঁব কবিতায

Ich vermochte nur wenig. Aber die Herrschenden
Sassen ohne mich sicherer, das hoffte ich.
(অল্পই অবশ্য আমার সাধ্য ছিল, তবু শাসকেব দল
আমি না-থাকলে আবো নির্বিঘ্ন হবে, এই ছিল আমার আশা।)—

এই মহান বক্তব্যেব তুলনায় অনেক বেশি মর্মস্পর্শী মনে হয়

Denn fur dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug.
(আমাদেব এই সংসাবে কোন লোকই যথেষ্ট পাজি নয।)

একদা শ্রীমতী হানা আরেণ্ট লিখেছিলেন, 'জর্মনির জীবিত কবিদের মধ্যে ব্রেখট সবাব উপরে।' এবং প্রখ্যাত সমালোচক ওয়ালটাব বেঞ্জামিন বলেছিলেন, 'ব্রেখটই একমাত্র জীবিত কবি যিনি সর্বদাই তাঁব প্রতিভাকে কোথায প্রয়োগ করতে হবে এবং কোথায তা থেকে নিরত থাকতে হবে সে-বিষয়ে সতর্ক ছিলেন।' ব্যবহারিক জগতের সৌন্দর্য কবিতায় ধাবণ করা সহজ ব্যাপাব নয, এবং সেই দুঃসাধ্য সৃষ্টিতে ব্রেখটের জুড়ি কবি যে-কোনো ভাষাতেই দুর্লভ। সচেতনভাবে যে-ভাষা তিনি ব্যবহার কবেছেন তা নিরাভরণ, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, এবং অপরকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝিয়ে কথা বলাব পক্ষে অসাধারণ তীক্ষ্ণ। লিরিকেব বিন্যাসে তাঁর পছন্দসই রূপবন্ধ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন লোকগীতিক ঐতিহ্যে। ফলে তাঁর কবিতা কখনো-কখনো লিবিকমর্মী হয়েও এক আশ্চর্য রূপান্তব লাভ করেছে হয়তো যুদ্ধের চিৎকারে অথবা কুচকাওয়াজের গানে। এই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, ব্রেখটের তির্যক, কখনো-বা-তিক্ত, অসংখ্য কবিতা—এবং সর্বোপরি, সহযাত্রী-মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল মননের জন্য—অনেকেরই মতে ব্রেখট এই শতকেব একমাত্র সত্যিকার সামাজিক-কবি, যাঁর দর্শনই তাঁর কবিতার ফর্ম এবং বিষয়কে এক-দেহ হতে সাহায্য করেছে।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের ইঙ্গ-মার্কিন কবিতার মনঃস্তত্ত্বগন্ধী, যুক্তিবিরোধী-অপ্রত্যক্ষতা ব্রেখটের কবিতায় যেন হঠাৎ শুনতে পেল নির্মম ভর্ৎসনা। বিশের এবং তিবিশের মার্কিনী ও অন্যান্য কবিদের আত্মকেন্দ্রিক উত্তেজনা, নৈবাজ্যবাদী নিরাশা, ইত্যাদি মূলত-অবাজনৈতিক চিন্তাভাবনার বিলাসী স্রোতে ব্রেখট তাই যেন নিয়ে এলেন এক নতুন বিপ্রতীপ ঝড়। কবি এবং শিল্পীকে তিনি দেখতে চাইলেন সমাজের চিন্তাশীল গোষ্ঠীব সদস্যরূপে, সমাজবিবেকের আধাররূপে, সুরুচির ধারকরূপে। ব্রেখটই বোধহয তাঁর সময়কার মার্কিনী কবিতার স্বরূপ উদঘাটিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে তার মধ্যে কোনোকালেই 'রাজনৈতিক কবিতা' দানা বাঁধতে পারেনি।

বের্টোল্ট ব্রেখট কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন জর্মন একসপ্রেশনিসমের আধিপত্যের যুগে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ হাউসপশটিলে-র মধ্যে সেই কারণেই হয়তো এক ধরণের রোমাণ্টিক তিক্ততা ছড়ানো কিংবা প্রচ্ছন্ন দেখা যায়। দৈহিক এবং নৈতিক কুশ্রীতা বিষয়েও তাঁর সে সময়ে যেন তীব্র আগ্রহ ছিল। এসবের হাত ধরেই তারপর এল ব্রেখটের সামাজিক চৈতন্য তথা অস্তিত্বের সংকট ও ত্রাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী নিরীক্ষার তাগিদ। আর মানুষের যন্ত্রণার গভীরে ডুব দিয়ে উঠে তিনি অনিবার্যভাবেই যেন হয়ে গেলেন নীতিমান কোন সন্তপুরুষ—রোমাণ্টিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সম্পূর্ণতই বিরোধীমুখী। মার্কসবাদও তার আপন দাবিতেই ব্রেখটের চিন্তায় দ্রুত সঞ্চারিত হলো।

কবিতার শরীর নিয়ে ব্রেখট কম ভাবেননি। যেমন ভেবেছেন 'এপিক থিয়েটারের' ভিন্নতর আঙ্গিক বিষয়ে। লোকায়ত ব্যালাডের ভাষায় তিনি একদিকে খুঁজে পেয়েছিলেন এক উদার ও উন্নত ভঙ্গি, অপরদিকে পেয়েছিলেন তাঁর সমকালীন প্রয়োজনে লাগসই উপকরণ—কুটিল ব্যঙ্গোক্তি এবং সামাজিক প্রতিবাদের উপযোগী রসনা—উইলিয়ম ব্লেইক ছাড়া অন্য কারো কবিতায় বোধহয় যার তুলনা মেলে না। ষোড়শ-শতকী ইংরেজি ব্যালাড, উনিশ-শতকী জর্মন লীড, আর হালের টিন-প্যান অ্যালি লিরিক—এই সব কিছু থেকেই নানাভাবে গ্রহণ করে কবি ব্রেখট যে নতুন ধরণের কবিতা সৃষ্টি করলেন তাতে সনাতন ঐতিহ্যের স্বাস্থ্যল কমনীয়তার ভঙ্গি এবং সমকালীন ঘটনার প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষের ভাষা এক অনন্য পরিণয়ে বিকশিত হলো। আর প্রথম দিকের কবিতার ভাষা প্রয়োগে সাবেকি লিরিকের যেটুকু উচ্ছলতাও বা ছিল, ব্রেখটের পরিণত পর্যায়ের লীডের, গেডিখটে ক্যেরে (১৯৩৪), সভেনডবোরগের গেডিখটে (১৯৩৯) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে, তাঁর সময়কার প্রচলিত কবিতার তুলনায়, ভাষার অবিশ্বাস্য রিক্ততা, সংযম এবং ইন্দ্রিয়ানুগ অলংকরণের অভাব লক্ষ্য হয়। চিত্রকল্পের ব্যবহারেও কঠোর মিতাচার কবিতায় এক অনাস্বাদিতপূর্ব নগ্ন নাটকীয়তা এনে দিল। রোমাণ্টিকতার অতি-কোমল স্পর্শ হয়তো গোপনে এখানে-ওখানে মুখ লুকিয়ে থাকার জায়গাটুকু মাত্র পেল, আবরনির তিক্ততার অন্তরে হয়তো থেকে গেল অপরিত্যাজ্য বিষাদের মৌল আবেগটুকু।

কবিতার শরীর বিষয়ে চিন্তা ব্রেখটকে আরেক দিকেও চালিত করেছে। গদ্য ও পদ্যের আপাত-শত্রুতার নিষ্পত্তি করতে চেয়ে তিনি এক ধরণের অমিল-কবিতা লিখেছেন। এই কবিতাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন গেষ্টিখ (Gestich)—যার বাচনছন্দের বিশিষ্ট বিন্যাস তিনি সৃষ্টি করেছেন এক অন্যধরণের যতিব্যবহারের কৌশলে। জোর ক'রে এখানে-ওখানে হঠাৎ যেন কথা বলা থামিয়ে দিয়েছেন কবিতার লাইন ভেঙে দিয়ে। এই লাইন ভাঙার ধরণ, তথা কথা বা বিষয়বিশেষের উপর হিশেবমতো ঝোঁক দেওয়া, এসেছে খানিকটা বাইবেলের বাচনরীতি থেকে, এবং বহুলাংশেই এসেছে চিনে কবিতার সংনমিত (compressed) সারল্যের উদাহরণ থেকে। এবং এই গেষ্টিখ-এর ব্যবহারের জোরে তাঁর অনেক কবিতাই এপিক-নাটক-সুলভ কোরাসের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে —যে কারণে ব্রেখটের কোন কবিতাটি স্বয়ংপূর্ণ আর কোন কবিতাটি কোনো সম্ভাব্য

নাটকের অনুষঙ্গ, ঠিক বলা যায় না। নাটক আর কাব্যের মৌলিক আত্মীয়তাও তাই ব্রেখ্‌টের গেষ্টিখ প্রয়োগের ফলে উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে। উভয় প্রকাশভঙ্গিতেই টেন্‌শন হয়ে দাঁড়িয়েছে লঘিষ্ঠ-সাধারণ-উপাদান। একই কারণে, উভয় প্রকাশভঙ্গিতেই পাঠক অথবা দর্শক, কবি কিংবা অভিনেতার সঙ্গে সহজ কথোপকথনে অন্বয়িত হতে পারছে।

প্রসঙ্গত, বের্টোলট ব্রেখটের প্রথম দিকের কবিতায়, বালাদ-এ, সাবেকি মিল ও ছন্দের বিরুদ্ধে কোনো ঘোষণা নেই। বরং চেনাজানা মাত্রাবৃত্ত পঞ্চপদী আয়াম্‌বিককে আশ্রয় করেই তাঁর প্রাথমিক যাত্রা। যদি বা দু-একটি পদ্যে মিল পরিহার করেছেন, ছন্দ সেখানে আঁটোসাটো। আবার, যেমন 'মৃত সৈনিকের বালাদ'-এ, ছন্দ অবিন্যস্ত কিন্তু মিল ঠিকঠাক। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় তাই সাবেকি ধরণে গানের সুর বসাতে ব্রেখ্‌টকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু পঞ্চপদী আয়াম্‌বিককে ব্রেখট শিগগিরই বর্জন করলেন! এবং এই বর্জন করার ইতিহাস থেকে আমাদের গভীর শিক্ষা নেবার আছে।

ব্রেখ্‌ট তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই মানুষের সামাজিক জীবনের অভ্যন্তরীণ নানা অসঙ্গতি লক্ষ করেছেন, কিন্তু তাঁর কাব্য অনুশীলনের প্রাথমিক পর্যায়ে সে-অসঙ্গতির রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ থেকেছেন। ফলে, প্রথানুগ পদ্যের রূপবন্ধ সম্বন্ধে তাঁর তৃপ্তি-অতৃপ্তিও অনেককাল পর্যন্ত বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করেনি। র‍্যাঁবো-র সংহত গদ্যকাব্য ব্রেখ্‌টকে উদ্‌বেজিত করেছিল, তার প্রমাণ আছে। এবং গদ্য-পদ্যের আত্মীয়তা সম্পর্কিত চৈতন্য ব্রেখটের মনে এক ধরনের প্রতিবাদও এনে দিয়েছিল—পঞ্চপদী মাত্রাবৃত্তের "তৈলাক্ত মসৃণতা"-র বিরুদ্ধে সংহত, উত্তোলিত কোন বাচনভঙ্গীর প্রয়োজন তখনই তিনি অনুভব করেছিলেন। এ-কথাও তিনি বুঝেছিলেন যে ছন্দকে হয়তো কোনো-না-কোনো ভাবে পদ্যের শরীরে ধ'রে রাখতে হবে ; যদিও সে-ছন্দ গতানুগতিক গজ-ফুট-ইঞ্চি মাপা ছন্দ নয়। গতানুগতিক ছন্দ পদ্যের প্রত্যেকটি বাক্যকে, লাইনকে স্তবককে একই স্পন্দনে বেঁধে রাখে, নির্বিশেষ একাকার ক'রে দেয় ; অথচ ছন্দহীন শরীরও শরীর নয়—পেটেপিঠে সমতল, সমতাল। এই চৈতন্য ব্রেখ্‌টকে যে আঙ্গিকে নিয়ে গেল তার প্রথম চমকপ্রদ প্রকাশ তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন 'জর্মন স্যাটায়ার্স'-এ। এই পর্যায়ের কাব্যে আছে এক ধরণের মিলহীন অসম-ছন্দ।

সামাজিক বক্তব্য এবং বিশ্লেষণের এক শক্তিশালী বাহন হিসেবেই ব্রেখ্‌ট কবিতাকে দেখেছেন—যে-কারণে প্রায়শই তাঁর কবিতাকে তাঁর নাটকের বাইরে এনে পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না। তিনি বাচনভঙ্গী এবং বক্তব্যের সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত ছিলেন, ভাষার প্রযুক্তিকৌশলই তাঁর প্রধান সমস্যা। কীভাবে বললে, যা বলছি তার অর্থ ও উদ্দেশ্য সরাসরি শ্রোতার মগজে ঢুকবে ব্রেখটের পদ্ধতির এটাই মূল ব্যাপার।

ব্রেখ্‌ট বলতেন, যে-ব্যক্তি কথা বলছে তার মনের গূঢ় ইঙ্গিত যেন তার সম্পূর্ণ

বাক্যেব বাচন ও ন্যাসে বিধৃত থাকে। তবেই সেটা কথা বলা। লুথর যে ভাবে কথা বলতেন, ব্রেখটেব ভাষায় তা হচ্ছে অপরের ঠোঁট-মুখ লক্ষ ক'রে কথা বলা। বাইবেলের বাক্য বিন্যাসেও এ-রকম প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতময়তা লক্ষ্যণীয়। আর গেষ্টিখেরই গুণে লুক্রেশিয়াস শুধু যে বক্তার মনোভাব স্পষ্ট করতে পারছেন তাই নয়, কথা বলতে বলতে বক্তা যে-ভাবে তাঁর ইঙ্গিতের পবিবর্তন ঘটাচ্ছেন তাও যেন ধরিয়ে দিচ্ছেন।

এখন, মানুষ যেভাবে সাধারণত কথা বলে তার ছন্দ যেমন স্বাভাবিক, মানবিক, তেমনই লক্ষ কবা যাবে যে সে-ছন্দ অসম—প্রথানুগ পদ্যাঙ্গিক নয়। একজন উত্তেজিত কিংবা বিপন্ন ব্যক্তি ছুটতে ছুটতে এসে যে-কথা বলছে, পঞ্চপদী আয়ামবিকে তার কী চেহারা ফুটবে? বক্তার এই যে শাবীরিক অস্থিরতা তার অসম-ছন্দে প্রকাশ পাচ্ছে, আমাদের সামাজিক পরিবেশেও তো প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তেমনি অনুভূতির অসমঞ্জস প্রকাশ নিহিত। সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা যতই ব্যক্তির চারিদিকে ঘিরে ধরছে, ততই কি তার বাচনভঙ্গী সেভাবে অবিন্যস্ত, দ্বন্দ্বময় অথবা অসম হয়ে যাচ্ছে না? পদ্যেব চলার ধরণ তাহলে কী ক'রে অপবিবর্তিত থাকবে? ব্রেখ্‌ট বহুভাবে লক্ষ ক'রে দেখেছিলেন তাঁর পরিপার্শ্বে নানা স্তরের লোক নানা পরিস্থিতিতে যে-ভাবে স্বাভাবিক বাচনে তাদের ভাব ব্যক্ত করে, কবিরা তার সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখেই পদ্য লিখে চলেন। তাঁদেব পদ্যের প্রকরণে ও আঙ্গিকে তাই প্রয়োজনের ছোঁয়া কোথাও নেই। মিছিলের স্লোগানে, যুদ্ধের কুচকাওয়াজে, পথচারী ফিরিঅলার ডাকে, সাবেকি নিগ্রো জ্যাজে তাই খুঁজে পাওয়া যায় স্বাভাবিকতার ছন্দ, যা তার প্রয়োজনের উৎস থেকেই অসমতাল —তার ঝোঁক কোথাও বেশি, কোথাও নগণ্য। এই উপলব্ধি থেকেই ব্রেখ্‌টের অ-সম ছন্দের জন্ম। এবং কাব্যের ছন্দকে জীবনের পরিবর্তমান ছন্দের সঙ্গে অন্বিত করার প্রস্তাবে ব্রেখ্‌টের কাব্যবিপ্লব পূর্ণতা পেয়েছে।

নাট্যকার ব্রেখ্‌টেব মতোই, কবি ব্রেখ্‌টও স্বভাবতই আর্টে নিছক প্রমোদ বিতরণ করতে নারাজ। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি অ্যারিস্টট্‌লের ক্যাথারসিস্‌-কে মদাত্যতার (culinary effect) অভিযোগে বর্জন করেছিলেন। সঙ্গীতেও, তিনি একমাত্র মোৎসার্ট ছাড়া আর খুব কম সঙ্গীতকারকেই শিরোপা দিয়েছেন। আর কবিতার ঐতিহ্যে, তাঁর অগ্রগামী রিল্‌কে-কে তিনি মূলত 'মনোরঞ্জনকারী' কবিই মনে করেছেন। কারণ, ১৯২৬-এ এক সাহিত্যিক প্রতিযোগিতায় ব্রেখ্‌টকে যখন প্রায় চারশ কবিতার মধ্য থেকে পুরস্কারযোগ্য একটি বাছতে বলা হলো, তখন রিল্‌কের উত্তরসূরি সেই সব তরুণ কবিদের সবার প্রতি তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন তারা সব "delicate dreamers and sentimental spokesmen of a winged bourgeoisie"। কোনো পরিহাস না-করেই, অবশেষে তার মধ্যে পাওয়া একটি কবিতা—যা এক চ্যাম্পিয়ন সাইকেলচালক সম্বন্ধে —নাবালক অথচ সতেজ ভাষায় লেখা—পছন্দ করে ব্রেখ্‌ট সেই কবিকে পুরস্কার দিলেন। এ-ব্যাপার থেকে লক্ষ করার বিষয় হলো ব্রেখটের এই বক্তব্য যে সামাজিক দাবিতে

সাড়া না দিতে পাবলে কবিতা অবশেষে নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে ব্রেখটের যে নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব দানা বেঁধে উঠেছে তাতে লক্ষ্যণীয় ব্যাপাব এটাই যে তিনি বিশুদ্ধ লিরিকের (Gedankenlyrik) ঐতিহ্য সচেতনভাবে বর্জন করে এমন ধরণেব লিরিক সৃষ্টিব কথা ভাবছেন যা পাঠকের মানসিক প্রয়োজনবোধের সঙ্গে সাযূজ্যপূর্ণ। এমন ধবণেব লিরিক রচনায় তিনি মনঃসংযোগ করলেন যা মানুষেব দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও নান্দনিক মূল্যবোধ এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ-বকম সম্পূর্ণ নূতন মেজাজের লিরিককে ব্রেখ্‌ট নাম দিলেন Gelegenheitsgedicht, যার মধ্যে কিন্তু তাৎক্ষণিক তথ্যসংলগ্নতার প্রত্যক্ষ তাগিদের চেয়ে অনেক বেশি প্রাধান্য পেযেছে পাঠকের বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে জাগ্রত কবার কাব্যিক প্রয়াস।

তর্ক-বিতর্ক পেবিয়ে ব্রেখটের কবিকর্ম এক বিস্ময়ের বস্তু হযে থাকবে। অনেক সহজ কথাই তাঁব কাব্যিক প্রযুক্তিব কৌশলে এবং মৌলিক আবেগের তীব্রতায় 'কঠিন-সহজ' উপলব্ধিতে রূপান্তবিত হয়ে গেছে। তাঁর high seriousness তাঁর কবিতাব এক অতি মূল্যবান কাব্যিক উপাদান, কবিতার বাইরের পোশাক নয। কারণ এই জর্মন কবি সর্বদাই স্রষ্টাব সঙ্গে অপরের নান্দনিক দূরত্বের (aesthetic distance) প্রযোজনীযতা সম্পর্কে ভাবিত এবং পরীক্ষানিরীক্ষায ব্যাপৃত থেকেছেন। সবচেয়ে দুঃখের হতাশাব কথাটিও তাই তিনি বলতে পেবেছেন এমন এক নির্মম ইতিহাসদৃষ্টি এবং নৈর্ব্যক্তিক সচেতনতা থেকে যে কান্নাব জলে কিংবা তিক্ততার ঝাঁজে চৈতন্য হাবিয়ে যেতে পাবে না। Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral (প্রথমে দানাপানিব কথা, তাবপরে সুনীতি-দুর্নীতিব প্রশ্ন)—এই স্পষ্ট সহজ বক্তব্য বের্টোলট ব্রেখটেব কাব্যিক ব্যক্তিত্বের জোরে একই সঙ্গে ক্রোধ এবং তিক্ত-বিষণ্ণতার মোহভঙ্গে উজ্জ্বল। দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী কবি, আদর্শবাদিতার ট্র্যাজিক অসারতায় তাই আপন কাব্যজিজ্ঞাসারও স্বাভাবিক দিকটি খুঁজে পেয়েছেন। অথচ "আমরা সবাই পশুর মতো মবি, এবং মৃত্যুর পবে আর কিছুই নেই"—একথা যখন তিনি কবিতায় উপলব্ধি করেন, তখন কিন্তু তিনি অন্য অনেক আপাত-স্বাভাবিক মানুষেব সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেন না : অতএব দায়িত্বজ্ঞানহীন ভোগবাদই এখন আমাদের সদর সড়ক। বরং ব্রেখ্‌ট বলেন, "Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut—anstatt so roh, doch die Verhältnisse sie sind nicht so." (দুনিয়া ভরা দারিদ্র্য, মানুষ খারাপ। আমাদের নির্মম না-হয়ে ভালোই হবার কথা, কিন্তু অবস্থা তা হতে দেয় না)।

বর্তমান অনুবাদসংকলনের অসম্পূর্ণতা একাধিক। সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়েও সম্পাদক হয়তো এই ব্যাপারে বিশ্বাসী যে ব্রেখটকে বাঙালি পাঠকের হাতে পৌঁছে দেবার এই ক্ষীণ প্রচেষ্টার কিছুটা সার্থকতা আছে। এবং যে-সব বাঙালি পাঠক জর্মন অথবা অন্য কোনো ইওরোপীয় ভাষায় ব্রেখটের কবিতা পড়েছেন তাঁদেরও হয়তো মাতৃভাষায় ব্রেখ্‌ট পড়তে গিয়ে অভিজ্ঞতায় কিংবা উপলব্ধিতে অল্পবিস্তর রূপান্তর হতে পারে। এটাই সংকলকের উদ্দেশ্য। নির্বাচিত কবিতাগুলিকে পর পর সাজাতে গিয়ে রচনাকাল-

পরম্পরায় বিন্যস্ত করার প্রচলিত রীতি পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়নি। তা কবলে হয়তো কবিব ক্রমবিবর্তন আক্ষরিক অর্থে নির্দেশিত হতে পারত। এবং হয়তো আরো প্রত্যক্ষ ভাবে বোঝা যেত যে তাঁর জীবৎকালের দ্রুতপরিবর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি, তথা সংকটাকীর্ণ মানুষের দ্বান্দ্বিক অবস্থানকে লক্ষ করেই ব্রেখট ক্রমাগত তাঁর কাব্যিক শৈলীতে রূপান্তর ঘটিয়ে গেছেন। এবং কবিও নিজেই সে-ভাবে রূপান্তরিত হয়েছেন এক ব্রেখট থেকে অন্যতব ব্রেখটে। তথাচ স্বতন্ত্র কবিতাগুলি এখানে সাজানো হযেছে অনেকটাই পাঠযোগ্যতার দিকে চোখ রেখে, ক্যালেণ্ডারের দিকে নজর না দিয়ে। শুধুমাত্র তিনটি দীর্ঘ সময়-বিভাজন (১৯১৩-২৮, ১৯২৯-৩৮ এবং ১৯৩৮-৫৬) অনুযায়ী কবিতাগুলিকে পড়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে অনুবাদকদের ইচ্ছা মেনে চলা হয়েছে যথাসাধ্য।

অবশ্য বলা যেতে পারে যে বিষয়গত সাদৃশ্য ও কবির মেজাজ মিলিয়ে কয়েকটি করে কবিতা পবপর একসঙ্গে রেখে সাজালে হয়তো ভিন্নতর স্বাদ পাওয়া যেত। কিন্তু যে-কবির অনেক কবিতাতেই শিক্ষণধর্মিতা (didacticism) এবং লিরিকধর্মিতা, তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক মন্তব্য এবং ব্যক্তিগত স্নিগ্ধতা, ইত্যাদি টানাপড়েনের মতো বোনা বযেছে, তাঁব কবিতার অনুবাদ সংখ্যায যত বেশি পাওয়া যাবে তাদের অর্থপূর্ণভাবে সাজানোর সমস্যাও হয়তো ততই বেড়ে যাবে। এসব সমস্যাব কথা মাথায় রেখে ব্রেখটেব কিছু কিছু কবিতার একাধিক অনুবাদ পাশাপাশি ছাপা হলো। একজন অনুবাদক হয়তো কবিব লিবিকধর্মিতার দিকটা তুলে ধরেছেন, অপরজন হয়তো রাজনৈতিক বক্তব্যবিন্যাসেব কাযদাটাকেই বড়ো কবে দেখেছেন। উপবন্তু, সংকলিত কবিতার অনেকগুলি কোনো-না-কোনো ব্রেখটিয় নাটকেব অন্তর্ভূত। সুতরাং, সেই কবিতাগুলিকে নাটকে প্রযুক্ত কবাব সময যে-আকাবে ও যে-ভাষায রূপান্তবিত করা সম্ভব বা প্রয়োজন মনে হযেছে, শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কাব্যবস ফুটিযে তোলার তাগিদে তাদেবই অনুবাদ হয়তো অনেকটা ভিন্নচরিত্রের করতে হয়েছে। যে-কোনো একটিমাত্র অনুবাদ পড়ে তাই ব্রেখটেব অনেক কবিতারই সম্পূর্ণ দৃশ্যপট একসঙ্গে হযতো ধরা যাবে না। মূল কবিতার অনন্য শব্দযোজনাব গুণে যে-মিশ্রভাব অথবা মিশ্রচিত্রকল্প একই জালে ধরা সম্ভব হযেছে, ভাষান্তবে তাকেই ধরতে গিয়ে হয়তো দুবার-তিনবাব বিভিন্ন কোণ থেকে একাধিক ধীববকে জাল ফেলতে হয়েছে। পর পব সব কটি অনুবাদ পড়লে এই কবিতাগুলির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণতর হবে মনে করে তাই এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি গ্রহণ কবা হলো। আরো অনেক কবিতাব ক্ষেত্রেই এরকম একাধিক অনুবাদ প্রকাশ সম্ভব ছিল, পাঠযোগ্য অনেক অনুবাদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সংকলন থেকে বাদ দিতে হলো। যাঁদের অনুবাদ ছাপা হলো তাঁদের সকলের কাছেই সম্পাদকের কৃতজ্ঞতা অপরিমেয়।

এই অনুবাদ সংকলন যাঁদের সহায়তায় সম্ভবপর হয়েছে তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ কবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকছি। 'ব্রেখট সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা এবং একদা-কর্ণধার, প্রয়াত অভিনেতা উৎপল দত্ত একসময় অনেক অনুবাদ আমার হাতে পৌঁছে

দিয়েছিলেন। সে কথা ভুলিনি। আর যাঁরা এই কাজে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন কবি শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অশোক মুখোপাধ্যায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব বহন করে প্যাপিরাস প্রকাশনাসংস্থার শ্রীঅরিজিৎ কুমার আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

মূল জর্মন থেকে দিলীপ ঘোষ অনূদিত ব্রেশ্‌টের প্রবন্ধ, "আমার মতে কেমন করে কবিতা পড়া উচিত", এই সংকলনের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরে উপকৃত হয়েছি। অনুবাদককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই শ্রীপঞ্চানন সাহাকে, যিনি দীর্ঘকাল ধ'রে 'ভারত-সমাজতান্ত্রিক জর্মনি' সাময়িকপত্রটিতে গভীর উৎসাহে ব্রেশ্‌টের নানা অনূদিত কবিতা ও অন্যান্য রচনা ক্রমাগত প্রকাশ করে গেছেন। সাময়িকপত্রটিতে প্রকাশিত অনেকের অনুবাদ এই সংকলনে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে তিনি সম্পাদককে বাধিত করেছেন।

সমীর দাশগুপ্ত

আমার মতে কেমন করে কবিতা পড়া উচিত

বের্টোল্‌ট ব্রেখ্‌ট

তোমরা আমার কবিতা নিয়ে নাড়াচাড়া করছ। কবিতা কেমন করে পড়া উচিত প্রায়ই অনেকে তা আমার আছে জানতে চায় ; তাছাড়া অভিজ্ঞতা থেকেও জানি, ছোটবেলায় আমরা কত কম উপভোগ কবি পড়ার বই-এর কবিতাগুলো ; তাই আমি কয়েক ছত্র লিখতে চাই, আমার মতে কেমন করে কবিতা তৃপ্তির সঙ্গে পড়া যেতে পারে—এ বিষয়ে।

কবিতা সবসময়ই ক্যানারি পাখির কূজনের মতো নয়। ঐ পাখির গান সুন্দর, কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। ভেতরের সৌন্দর্যকে বের করে আনার জন্য কবিতাকে কিন্তু থেমে থেমে পড়তে হয়। উদাহরণ হিসেবে আমি উল্লেখ করছি ইয়োহানেস্ এ্যার বেশারের 'ডয়েচলাণ্ট'* গানের প্রথম স্তবকটির কথা ; ওটা তোমরা নিশ্চয়ই হান্স আইসলারের দেওয়া সুরে গেয়েছ :

'স্বদেশ, আমার যন্ত্রণা –
গোধূলিতে তুমি ঢাকা
আকাশ, আমাব গাঢ়তর নীল আকাশ—
তুমিই আমার শান্তি।'

এর মধ্যে কী আছে যা সুন্দর?

এই কবি তাঁর স্বদেশকে বলেছেন 'গোধূলিতে ঢাকা'। গোধূলি হলো দিন ও রাতের মাঝখানের একটি সময়, অথবা রাত ও দিনেব, যখন আলো হারিয়ে যায় অন্ধকারে অথবা অন্ধকার আলোয়। এ হলো সেই ধূসর মুহূর্ত, যাকে ফরাসীরা বলে—'Entre chien et loup', যার জার্মান হলো—'Zwsichen Hund und Wolf' অর্থাৎ সেই সময়, যখন মানুষ ভালোর থেকে মন্দকে পৃথক করতে পারে না। এইরকম এক গোধূলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি তাঁর নিজের দেশে, যখন ফাশিজম ও অমানুষিকতার অন্ধকার আগতপ্রায়, এবং সমাজবাদের প্রত্যুষ আসন্ন। এই জন্যই কবির কাছে তাঁর স্বদেশ—'স্বদেশ আমার যন্ত্রণা' এবং একই সঙ্গে 'তুমিই আমার শান্তি'। আর সবসময তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর স্বদেশের সৌন্দর্য, যার কথা রয়েছে তৃতীয় পংক্তিতে—'আকাশ, আমার

* 'ডয়েচ্‌লাণ্ট' কবিতাটির প্রথম স্তবক সম্বন্ধে ব্রেখ্‌টের সপ্রশংস ব্যাখ্যা ছাড়া তার কাব্যরস বাংলা অনুবাদে সামান্যই প্রতিভাত হয়েছে। সরাসরি ভাষান্তরের প্রাথমিক সমস্যাটাই এত মৌলিক এবং অনতিক্রম্য। (সম্পাদক)

গাঢ়তর নীল আকাশ'। এই সৌন্দর্য অনাহত, এমন কি নেকড়ের রাজত্বেও।

এই হলো কবিতাটির মর্মবাণী। এবং এ সুন্দর—কেননা কবির অনুভূতি গভীর ও মহৎ, কেননা কবি তাঁর দেশকে ভালোবাসেন—যন্ত্রণায় যখন অশুভেব শাসন, এবং সুখে যখন শুভ প্রতিষ্ঠিত।

প্রকৃতই, যথেষ্ট সৌন্দর্য রয়েছে কবির বলার ভঙ্গির মধ্যে। 'স্বদেশ, আমাব যন্ত্রণা'—কথাটা এব থেকে ভালো কবে বলা সম্ভব নয, যেমন সম্ভব নয় ভালোতর করে বলা—'তুমিই আমার শান্তি'। এ যেন এমন কোনো লোক যে শোকে আক্রান্ত এবং আচ্ছাদিত কালো পোশাকে ; সেই লোক, যাকে জিজ্ঞেস কবা হয়েছে কেন তাব যন্ত্রণা এবং সে উত্তবে বলছে : 'আমাব দেশ এখন ঘাতকদের কবলে'। আবাব একই সঙ্গে, এ হলো এক উৎফুল্ল এবং সঙ্গীতমুখব মানুষ ; উৎফুল্ল ও সঙ্গীতমুখর—কেননা আমাব দেশ গড়া হযেছে শান্তি দিয়ে। অর্থাৎ, এই মানুষটিব সুখ অন্যান্য মানুষেব সুখেব ওপবে নির্ভবশীল। 'শান্তি' শব্দটি বিশেষভাবে সুন্দব ; অতি পরিচিত এই কথা, তবু এতে বযেছে এক নতুনত্বেব ছাপ ; কেননা এমনি করে এ কথাটাকে আগে কেউ কোনোদিন ব্যবহাব কবেনি। 'আকাশ, আমাব গাঢতর নীল আকাশ'ও সুন্দর, কেননা তা উচ্চাবিত হচ্ছে এক আশ্চর্য নম্রতায। কবিব প্রযোজন শুধু 'নীল' কথাটি : আর যেই ব্যবহৃত হলো কথাটি, অমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশ। এবং ভাবী সুন্দব এই কবিতাটিব ছন্দ, এতে বযেছে এক বিশাল তৃপ্তিব প্রতিভাস। এমন কি, না বুঝেও যদি তোমবা এ কবিতাটিকে পড তাহলেও তোমবা বুঝবে আমাব কথাব মর্ম ; এবং বিশেষভাবে সহজ হযে উঠবে সমস্ত ব্যাপাবটা যদি তোমবা এটাকে গেয়ে ওঠ আইসলারের দেওয়া সুন্দব সুবে।

আশা কবছি, খানিকটা চুলচেবা বিচাব কবে এ কবিতার কোনো রসহানি ঘটাইনি। গোলাপ তাব সম্পূর্ণতায় সুন্দর, তবু তার প্রতিটি পাপড়িরও সৌন্দর্য আছে। আমি বিশ্বাস কবি, যদি ঠিকমত কবিতা পডা যায় তাহলে কবিতা সত্যিই তৃপ্তিব খোবাক হযে উঠতে পাবে।

রচনাকাল

১৯১৩–১৯২৮

বেচারা বি. বি.-র বিষয়ে

১
আমি, বের্টোলট ব্রেশট, কালো অরণ্যানী আদিবাস।
শহরে বয়ে এনেছে মা আমাকে, আমি যবে তার
ভিতরে ছিলাম শুয়ে ; অরণ্যের শীতল নির্যাস
থাকবে আমার মধ্যে আমরণ উত্তরাধিকার।

২
পীচঢালা রাস্তার শহরে আমি ভালো থাকি।
অনাদি প্রহর থেকে
আমার সম্বল শুধু অবলেপ মৃত্যুময়তার :
খবরের কাগজে। আর ধূম্রপানে। আর কড়া মদে।
সন্দিগ্ধ, অলস আর পরিশেষে চিত্ত খুশি যার।

৩
মানুষজনের প্রতি বন্ধুজনোচিত ব্যবহার,
আঁটো টুপি পরে থাকি, প্রচলিত যেমন সমাজে,
বলি : গন্ধময় পশু সে বড়োই বিচিত্র ব্যাপার,
আরো বলি : এবং আমি তাদের দলভুক্ত নিজে।

৪
সকালের দিকে শূন্য ইজিচেয়ারগুলোতে আমার
সময় পেলেই কটি রমণীকে বসাই আদরে
তাদের দিকে তাকাই নির্ভাবনাময়, বলে উঠি :
সামান্য আস্থাও তোমরা রেখো না হে আমার উপরে।

৫
এবং সন্ধের দিকে জড়ো করি কজন পুরুষ
আমরা 'জেন্টলমেন' বলে ডাকি পরস্পরকে।
টেবিলগুলোয় ওরা পা উঠিয়ে বলাবলি করে :
'দিনকাল ভালো হবে আমাদের।'
জানতে চাই না আমি, কবে?

৬

ধূসর আভার ভোরে ঝাউ করে জল নিষ্কাশন,
চেঁচামেচি শুরু কবে তার যত আশ্রিত পাখিরা সে সময়,
শহরের সবাইখানায় টানি গেলাস তখন
তামাকেব ধ্বংস-অবশেষ ফেলে অশান্ত ঘুমোই।

৭

আমরা বসেই থাকি, এক অতি পলকা শ্রেণী সেই
বাড়িঘবে যাবা আগে গণ্য ছিল ধ্বংসাতীত ব'লে
(আমবা গড়েছি খুব উঁচু বাড়ি মানহাটান দ্বীপে,
আব সূক্ষ্ম এবিযেল, অতলান্ত সাগবমণ্ডলে)।

৮

ভিতরে-বাহিত হাওযা—তা ছাড়া থাকবে না কিছু
এই সব শহরগুলোব।
বাড়িব সর্বস্ব খেযে তৃপ্ত খুব ভোজনবসিক
আব আমবাও জানি আমবা যে নিতান্ত নশ্বব
আমাদেব পরেও তেমন কিছু ঘটবে না ঠিক।

৯

অনিবার্য ভূমিকম্প ঘনাবে যখন, আশা করি
ভার্জিনিযা চুরুট আমাব যেন স্তিমিত না হতে দিই তিক্ততাবশত।
আমি, বের্টোলট ব্রেশট, কালো অরণ্যানী থেকে সেই-কবে আমার
মাযের ভিতর থেকে পীচঢালা পথেব শহরে বিতাড়িত।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বেচারা বের্টোল্টের জন্য

আমি, বের্টোলট ব্রেখট, এসেছি কৃষ্ণ-অরণ্য থেকে
আমার মা আমাকে ব'য়ে এনেছিলেন শহরে, আমি তখনো তাঁর পেটে
আর আজও লেগে আছে সেই অরণ্যেব হিম
আমার অন্তরে সে বুঝি থেকে যাবে আমাব শেষ দিনেও।

এই সিমেণ্ট শহরে স্বচ্ছন্দ বোধ করি। শৈশব থেকেই
সব কিছু অতিরিক্ত পেয়ে আসা—সংবাদপত্রের প্রসাদ,
তামাকেব, আব তেমনি ব্র্যাণ্ডিবও।
সন্দেহবাতিক মন, অলস, অথচ তুষ্ট শেষটায।

মানুষেব সঙ্গে আমি দোস্তি কবি। আর
মাথায একটা টুপি লাগাই অন্য সকলেব মতো।
হযতো কখনো ব'লে বসি : ওবা সব কটুগন্ধ জীব
আবার তখনই বলি : ঠিক আছে, আমিও তো তাই।

দুপুবেব আগে আমার দোলানো চেযারটায বসি,
দুপাশে স্ত্রীলোক দুজন,
তাদের দিকে অমনোযোগী দৃষ্টিতে তাকাই আব বলি :
তোমাদেব পাশে দেখ এই একটি পুরুষ যার উপবে
তোমবা ভরসা কবতে পারবে না।

সন্ধ্যার দিকে আমাব চাবপাশে কিছু লোক জমায়েত হয।
পবস্পবকে আমবা সম্বোধন কবি 'মহাশয়' বলে।
তাবা আমার টেবিলে পা তুলে দেয
বলে : অবস্থার উন্নতি ঠিকই হবে। আমি জিগেশ কবি না কবে।
ভোরের ধূসব আলোয পাইন গাছেবা যখন জল নিঃসারণে রত,
তাদের পরগাছা পাখির দল কিচমিচ শুরু ক'বে দেয।
শহবের সেই প্রহবে আমাব গেলাশ শূন্য ক'রে দিই,
পাইপ ঝেড়ে ফেলি। তারপব অশান্ত ঘুম।
... ...
এই সব শহরের অবশিষ্ট থেকে যাবে শুধু বাতাস, যা সেখানে ব'যে গেছে
বাড়ি তৈবি হয়েছিল ভোজের ফূর্তি বাড়াতে : এখন তা শূন্য।
জানি আমরা সাময়িক কালেব যন্ত্রবিশেষ
আমাদের পরে থাকবে—প্রায কিছুই না।

তবু যে ভূমিকম্প অতঃপব আসবে তাতে আশা করব
তিক্ততা এড়িয়েই নেভাতে পাবব আমার চুরুটের আঁচ।
আমি বের্টোলট ব্রেখট, পথ-হাবানো এই সিমেণ্ট শহরে,
এইখানে অরণ্য থেকে এনেছিলেন মা আমাকে বহুকাল আগে।

সমীর দাশগুপ্ত

ফ্রাঁসোয়া ভিয়ঁ সম্বন্ধে

১

ফ্রাঁসোয়া ভিয়ঁ—সে ছিলো বেআক্কেলে, দুঃস্থ ও হাঘরে—
কনকনে হাওয়া তাকে শুনিয়েছে ঘুমপাড়ানিয়া সোঁ-সোঁ শন-শন—
পেছল তুষারকাদা ছিলো তার আচাভুয়া ছেলেবেলা ভ'রে,
বাহারে যদি-বা কিছু থেকে থাকে, সেটা ছিলো অবারিত অসীম গগন।
শোবে যে—ফ্রাঁসোয়া ভিয়ঁ পরিপাটি বিছানা পায়নি কোনো রাতে—
বুঝেছিলো কে আপন, যখন হাওয়ারা এসে খেলা ক'রে যেতো তার সাথে।

২

পিঠে ক্ষত, পায়ে রক্ত। বেচারা অনেক ঠেকে শেষতক বোঝে
ঘায়েল করতে পটু বরং শিলার চেয়ে ছোটো-ছোটো ঢেলা—
আশপাশে যা-ই দ্যাখে নির্ভুল নিশানা ক'রে ঢিল ছোঁড়ে ও যে—
চামড়া ছাড়িয়ে নিলে পারণ দারুণ জমে সাতদিন বাদে এক বেলা।
    এবং বাড়ায় যদি টেনে তাকে গায়ে পাবে হিম্মত, জোর—
    টেনে বাড়ানোই হয় তাই তার একমাত্র সরেশ উত্তর।

৩

প্রভুর টেবিলে ভোজে বসবে যে, পায়নি সে তার অনুমতি।
স্বর্গের উপচারে পায়নি সে আচানক কোনো অধিকার—
এদিক-ওদিক চাকু চমকে-দেয়া তার ছিলো বেহেড নিয়তি,
ওরা যদি ফাঁদ পাতে, অনায়াসে সেই ফাঁদে সে বাড়াতো ঘাড়।
    খাক তবে তারা তার পোঁদে চুমু, যখন সে সবে তার পাতে
    নিয়েছে দু-চার পদ—তুচ্ছ অতি—তবু তোষ, বাহা তোষ, তাতে।

৪

স্বর্গের সওগাত কিছু কখনও দ্যাখেনি চর্মচোখে—
গুমোর ভেঙেছে তার কোতোয়াল বিশাল থাবায়—
তবু সেও ছিলো কিন্তু প্রভুরই সন্তান : ভালো ক'রে চিনে রাখো ওকে,
যদিও জোটেনি তার সবদিন চর্বচোষ্য বাহারে খাবার।
    কতকাল ধ'রে সে যে ছুটেছে টগবগ শুধু বেপরোয়া ঝড়ে—
    ইনাম ছিলো তো শুধু ফাঁসিকাঠই—ভয় ছিলো কবে ঝুলে পড়ে।

৫
ফ্রাঁসোয়া ভিয়ঁ—সে তবু পড়েনি ফাঁদের মধ্যে ধরা।
মরেছে কোথায় কোন্ ঝোপে প'ড়ে, এড়িয়ে হাজত আর ফাঁসি।
অকথ্য রংবাজ সং ছিলো তার আত্মা, মৃত্যুহারা,
আমারই গানের মতো তারও কথা হবে না কখনও সাত-বাসি।
হাত-পা ছড়িয়ে বেশ চিৎপাত শুয়েছে শেষমেশ—
এই প'ড়ে-থাকাটাই তার তোফা লেগেছিলো, বিশেষ সরেশ।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ধন্যবাদের গান

স্তবগান করো এই রাত্রির, এই আঁধারের, যা তোমাদের চারিদিক ঘিরে!
ভিড়ে ভিড়ে একাকার হয়ে
চোখ মেলে দ্যাখো ঊর্ধ্বে অন্তরীক্ষ,
এখনই দিনমান তোমাদের ফেলে উধাও হয়ে যাচ্ছে।
জয়গান গাও ঐ ঘাসের আর জীবজগতের—তোমাদের প্রতিবেশী,
যারা বাঁচে আর ম'রে যায়।
তোমাদেরই মতো প্রাণ
ঐ তৃণের এবং জন্তুর,
তোমাদেরই মতো মৃত্যুও ভাগ্যে তাদের।

বন্দনা করো এই বৃক্ষের, ঊর্ধ্বপথে চ'লে গেছে যে আপন আনন্দে
গলিত পিশিত থেকে দূর অমর্ত্যের পানে
বন্দনা করো এই বৃক্ষের সেই স্খলিত আহার
এবং ঊর্ধ্বের আকাশকেও তেমনিই অভিনন্দিত করো।

হৃদয়ের অন্তর থেকে সাধুবাদ করো
আকাশের হেলাফেলাকেও
কারণ তার জানা নেই
তোমাদের কী নাম অথবা মুখের চেহারা
কেহই জানে না তোমরা এখনো এখানে আছো কিনা।

এই শীতলতা, একে ধন্যবাদ করো, এই বিকৃতিকে!
সুদূরে তাকিয়ে দ্যাখো :
তোমাদের কথা কেউ একটুও ভাবে না।
বিচলিত না-হয়ে তাই তোমাদেরই খুশিমতো তোমরা মরতে পারো।

সমীর দাশগুপ্ত

মারী আ-র স্মৃতিতে

সে এক নীলে নীল সেপ্টেম্বর মাস, জামরুল গাছের নিচে
নীরবে তাকে আমি জড়িয়েছিলাম এই বুকে
বাক্যহীন অনুজ্জ্বল প্রিয়া আমার বাহুর বাঁধনে
ছিল কোমল স্বপ্নের মতো, সুখে।

আমাদের মাথার ওপর তখন গ্রীষ্মের মধুর আকাশে
ছিল এক মেঘ, চোখে পড়েছিল চকিতেই
আশ্চর্য শুভ্রতা তার, কী ভীষণ ঊর্ধ্বে আমাদের
আমি মুখ তুলে তাকাতেই, দেখি, সেই মেঘ আর নেই

তারপর কত কত মাস চলে গেছে
নীরবে হারিয়ে গেছে নিরুদ্দেশে
জামরুল গাছ সব নিশ্চয় এতদিনে কাটা হয়ে গেছে।
যদি কেউ জানতে চাও সে নারীকে কোথায় রেখেছি,
অকপটে বলবো তাকে ভুলে গেছি, নিঃশেষে ভুলেছি
আমি জানি তোমাদের এমন প্রশ্নের কি কারণ
কিন্তু সত্যি আমি ভুলে গেছি কেমন ছিল যে সেই মুখ
সব ভুলে মনে আছে সেদিনের শুধু সে-চুম্বন।

চুম্বনও ভুলতাম আমি নিশ্চিন্তে সহজে
সেদিন আকাশ যদি নির্মেঘ হতো
সেই মেঘ এখনও দু-চোখে দেখি দেখবো জানি সমস্ত জীবন
নিদারুণ শুভ্র সেই মেঘ, ভাসছিল তুষারের মতো।

সে সব জামরুল গাছে সম্ভবত ফল ধবে বছরে বছবে
হযতো সে-নাবীব কোল সপ্তম সন্তান কবে আলো
কিন্তু সে মেঘটুকু মুহূর্তেব জন্য ফুটেছিল,
মুখ তুলে তাকাতেই বাতাসে মেলালো।

আশিস মজুমদার

মারি এ-র স্মরণে

যেন কবে কোন নীলে নীল আশ্বিনে
নীববে দু-জনে মিলেছি বকুল বনে
বেঁধেছি ত্রস্ত বাক্যবিহীন প্রিয়া
সে স্বপ্নশবীবিণী বাহু বন্ধনে।
মাথাব উপরে শবতবেলাব মেঘ
ছিল ভাসমান, চকিতে চক্ষে পড়ে,
সে-যে কি শুভ্র, সে-যে কি সুদূব ছিল,
ফিরে তাকাতেই, দেখি তা গিয়েছে সরে।

২
আহা, দিন কাটে, কত কত চাঁদ গেছে
স্তব্ধ আকাশ সাঁতরে কোথাও চলে?
হযতো বকুল গেছে কুড়োলেব ঘায
যদি-বা শুধাও, যে নারী বকুলতলে
ছিল, সে কোথায়, বলি না, স্মরণে নাই—
আমি জানি, কোন প্রশ্নজড়িত মন—
ভাবি, কি জানি সে কেমন দেখতে ছিল
শুধু মনে পড়ে তার মুখে চুম্বন।

৩
আর সে চুমাও হারাতো বিস্মরণে
সে দিন আকাশ মেঘ না ভাসিয়ে দিলে,
মনে আছে সেই মেঘটুকু, মনে আছে
সে-যে কি-শুভ্র বুক ছিঁড়ে আসা নীলে।

হয়তো বকুলে ডাল ভরে আসে ফুল,
সে নারীরও কোলে আসে সপ্তম শিশু
আহা সেই মেঘ, ক'মিনিটই তার আয়ু
দেখেছি গেল তা হাওয়ায় হাওয়ায় মিশে।।

তরুণ সান্যাল

মাইকের জন্য কয়লা

আমি শুনেছি ওহায়োর বিডওয়েলে
এই শতাব্দীর শুরুতে
একজন নারী কিভাবে ছিলেন বেঁচে।
নাম তাঁব মেরী ম্যাকয়,
মাইক ম্যাকয় নামে একজন ব্রেকম্যানের
বিধবা পত্নী তিনি, দারিদ্র্যে কাটাতেন জীবন।

কিন্তু প্রতিরাত্রে হুইলিং রেলরোডে বজ্রশব্দে যাওয়া ট্রেন থেকে
ব্রেকম্যানেরা পাহারার বেড়ার ওপর দিয়ে—
আলুক্ষেতে জমা ক'রে যেত কয়লার চাঁই,
কর্কশ গলায় সংক্ষেপে চেঁচাত :
মাইকের জন্য।

যখনই মাইকের জন্য সে কয়লার চাঁই
কুঁড়েঘরের পেছন দেয়ালে ধাক্কা খেত,
বৃদ্ধা সে নারী উঠতেন
নিদ্রায় মাতাল, গুড়ি মেরে ওভারকোট প'রে,
কয়লার চাঁই সব সরাতেন একপাশে।
মৃত মাইককে মনে রেখে ব্রেকম্যানদের উপহার
কয়লার চাঁই।

আর ভোর হবার বহু আগে উঠে বৃদ্ধা তাঁর উপহার
লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে নিতেন

যাতে হুইলিং রেলরোডের ব্যাপারে
লোকগুলোকে কোনো ঝামেলাই পোয়াতে না হয়।

[কবিতাটি ব্রেকম্যান মাইক ম্যাকয়ের সহকর্মীদের প্রতি সহযোদ্ধাসুলভ
মনোভাবের জন্য উৎসর্গীকৃত। মাইক ম্যাকয় ফুসফুসের
দুর্বলতাবোগে ওহায়োর কয়লাট্রেনে মারা যায়।]

আশিস মজুমদার

মাইকের জন্য কয়লা

ওহায়োতে আমি গল্প শুনেছি,
অনেকদিন আগে, এই শতাব্দীর শুরুতে
দারিদ্র্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে
বিডওয়েলে এক মহিলার দিনযাপনের কথা!
যার নাম ছিল মেরী ম্যাকয়,
মাইক ম্যাকয় নামে এক ব্রেকম্যানের বিধবা।
কিন্তু প্রতি রাত্রে গর্জমান দুরন্তগতি ট্রেনগুলো থেকে
ব্রেকম্যানেরা ছুড়ে ছুঁড়ে দিতো
টুকবো টুকরো কয়লা,
তাব কুটিরের বেড়ার গায়ে কিংবা আলুক্ষেতের ওপর।
আর কর্কশ গলায় অল্প আওয়াজ তুলে
বলে যেতো,
"মাইকের জন্যে"।
আর প্রতি রাত্রেই যখন "মাইকের জন্যে" কয়লা-টুকরো-গুলোর আঘাতে,
কুটিরের দেওয়াল কেঁপে কেঁপে উঠতো,
বৃদ্ধা জেগে উঠতেন ঘুম ভেঙ্গে
দুচোখ ভরা ঘুম নিয়ে, জীর্ণ ওভারকোট জড়িয়ে,
হামাগুড়ি দিয়ে কয়লার টুকরোগুলো
সরিয়ে রাখতেন একপাশে।
কয়লার টুকরোগুলো,
মাইকের প্রতি ব্রেকম্যানদের উপহার।
মাইক মৃত
কিন্তু বিস্মৃত নয়।

তারপর, ভোরের আলো ফোটার অনেক অনেক আগে উঠে
এই কুটিল পৃথিবীর দৃষ্টির আড়াল করে
লুকিয়ে ফেলতেন এই উপহার।
যাতে চলন্ত ট্রেনের মানুষগুলোর কোনও বিপদ না ঘটে।

অনুপম গুপ্ত

সৈনিকের গান

মারণাস্ত্ররা ছড়াবে আগুন ঝলসাবে তরোয়াল
মৃত্যুশীতল জলেতে দাঁড়িয়ে হিম হয়ে যাবে দেহ
তারই মাঝখানে ঠিক রেখো মাথা নেমো না তুষার স্রোতে
সতর্ক ক'রে দিয়েছিল বউ চোখে শঙ্কিত স্নেহ।
সেদিন বীরের হুঁশ ছিল নাকো অস্ত্রের সম্ভারে
হেঁকেছিল তাই স্ত্রীর মুখ চেয়ে গভীর অবিশ্বাসে
দামামার বোলে পা ফেলে সেদিন ছুটেছে অন্ধকারে—
দামামার ধ্বনি ঝরায় না খুন যুদ্ধভূমির ঘাসে
ভয় কোরোনাকো বলেছিল ডেকে শঙ্কিত দয়িতারে
ছুরি ধরবার জন্যেই নাকি তৈরি এ অঙ্গুলি
উত্তর হতে দক্ষিণ নাকি ব'সে আছে তারই তরে
কবে সে দৃপ্ত পায়ে পায়ে এসে ওড়াবে পথের ধূলি।
দোহাই তোমার যেওনাকো দূরে বিপদের মাঝখানে
প্রাজ্ঞজনেরা বারবার বলে যুদ্ধই মহাকাল
সে কথায় যদি করো পরিহাস হতে হবে অনুতপ্ত
বলেছিল বধূ, ফেলে দাও ছুঁড়ে হিংস্র এ তরোয়াল।
বীর সে তরুণ পিস্তল হাতে হেসেছিল উপহাসে
কি করে তুষার হিমহাতে তার ছোঁবে এ উষ্ণ দেহ
সদম্ভে ব'লে ঝাঁপ দিয়েছিল মৃত্যুশীতল স্রোতে
এপারে দাঁড়িয়ে রইল দয়িতা চোখে শঙ্কিত স্নেহ।
যেতে যেতে ফিরে বলেছিল বীর দয়িতারে তার ডেকে
আমাদের দেখা হবে যে আবার পূর্ণ চাঁদের রাতে
শেষ হবে এই ক্ষণবিচ্ছেদ মিলনের উত্তাপে
যেদিন দূরের পাহাড়ের চূড়া ধোয়া হবে জ্যোৎস্নাতে।
তুমি চ'লে গেছ যেমন কী দ্রুত চলে যায় কুয়াশারা
প'ড়ে আছে দিন উত্তাপহীন নমিত ক্লান্ত শোকে

আর প'ড়ে আছে গৌরব কিছু তোমারই তো ফেলে যাওয়া—
গৌরবে ভ'রে ওঠে না তিমির আশার সূর্যালোকে।
বলেছিল বউ অস্ফুটে শুধু ঈশ্বর ওকে রেখো—
বীর সে তরুণ একহাতে ছুরি আর হাতে পিস্তল
তুষারের স্রোতে সঙিনের ভিড়ে কখন গিয়েছে ডুবে
কখন যে তাকে নিথর করেছে মৃত্যুশীতল জল।
পাহাড়ের চূড়া ভেসে যায় সাদা জ্যোৎস্নার বন্যায়
বীর ভেসে গেছে কালরাত্রির তুষারের ঘূর্ণিতে
কেন যে হে বীর দয়িতা নারীর নিষেধটি শুনলে না
প্রাজ্ঞজনের ব'লে দেওয়া সীমা কেন গেলে চূর্ণিতে।
কীর্তি তোমার কোনদিন আর ঘনিষ্ঠ উত্তাপে
আতপ্ত করে দেবে না প্রিয়ারে প্রখর রৌদ্রালোকে
তুমি চ'লে গেছ যেমন কী দ্রুত চ'লে যায় কুয়াশারা
প'ড়ে আছে দিন উত্তাপহীন নমিত ক্লান্ত শোকে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

মৃত সৈনিকের উপকথা

পঞ্চমতম বসন্ত এলো যুদ্ধে
ধারে কাছে নেই শান্তির কোনো লক্ষণ
গোল্লায় যাও ব'লে জনৈক সৈনিক
যুদ্ধক্ষেত্রে মরল বীরের মতন।

যুদ্ধ তখনও চলছে হয়নি শেষ
সৈনিক তার সময় আসার আগে
ম'রে প'ড়ে আছে এই ভেবে কাইজার
নীলচে হলেন রাগে।

গ্রীষ্ম বইল সমাধিস্থল ঘিরে
সৈনিক সে তো নিদ্রায় অচেতন
এমন সময় সেখানে উপস্থিত
মিলিটারীদের মেডিক্যাল কমিশন।

পৌঁছল তারা অনুসন্ধান শেষে
সৈনিকটির কবরে
মন্তরপূত বেলচাটা দিয়ে খুঁড়ে
তুলে নিল তাকে কবরের থেকে ওপরে।
দেহের যেটুকু তখনও হয়নি ধুলো
তাই নেড়ে চেড়ে দেখলেন ডাক্তার
দেখলেন তিনি সবই তো রয়েছে ঠিক
ভীরু সেই পলাতকটার।

সৈনিকটিকে চলল সঙ্গে নিয়ে
রাত্রিটা ছিল সুনীল ও মনোহরা
দেখা যাচ্ছিল খুললে শিরস্ত্রাণ
আকাশের বুকে পরিচিত সব তারা।

কড়া মদ ঢেলে শরীরের প্রতি অঙ্গে
চেষ্টা চলল জীবন ফিরিয়ে আনবার
দু বাহুতে তার ঝোলাল দুজন নার্সকে
একই গতি হলো অর্ধনগ্ন বৌটার।

যেহেতু গন্ধ ছাড়ছিল মৃতদেহে
তাই জনৈক পুরোহিত তন্ময়
আগে নেচে চলে হাতে নিযে ধুপধুনো
সে যাত্রা যাতে সুগন্ধময় হয়।
সামনে বাজনা জিঙ বুম বুম তালে
বাজাল ফুল্ল কুচকাওয়াজের সুর
সৈনিক তার পুরোনো শিক্ষামত
পা দুটো নাড়ল চলল সে যদ্দূর।

দুই বাহু ধ'রে হাঁটে দুই শ্বেতপক্ষী
ধ'রে আছে তাকে যত্নে শক্ত ক'রে
প'ড়ে যায় যদি মাটিতে জলে কাদায়
তাই সতর্ক, কিছুতে যাতে না পড়ে।

শবাচ্ছাদন রঙে রঙে মাখামাখি
লাল সাদা কালো উজ্জ্বল রঙ সব

সামনেও ছিল রঙিন পতাকা, ফলে
কেউ দেখল না নোংরা গলিত শব।

সবার পেছনে লম্বা পদক্ষেপে
হাঁটছিল এক জর্মন নাগরিক
বুক তার করে ওঠা নামা যত হাঁটে
যোগ্য সে বটে জর্মন নাগরিক।

এগোচ্ছে তারা জিঙ বুম বুম তালে
উচ্চ এবং ছায়াময় পথ ধ'রে।
সৈনিক দোলে, নড়েচড়ে তার দেহ
ববফ টুকরো যেমনটি হয় ঝড়ে।

কুকুর বেড়াল চিৎকার ক'রে ওঠে
মেঠো ইঁদুরেরা তাকে দেখে ডাক ছাড়ে
ভাবেও না তারা ফরাসী হওয়ার কথা
অত কলঙ্ক কি ক'রে বইবে ঘাড়ে।

এবং যখন পার হয় গ্রাম গঞ্জ
রমণীরা এসে ভিড় ক'রে ঘিরে ধরে
গাছগুলো হয় আনত ; পূর্ণ চাঁদ,
সকলে চেঁচায় ফুর্তিতে আহা, ওহোরে।

জিঙ বুম বুম তালের বাদ্য বিদায় বিদায় গানে
পুরুত কুকুর রমণীর দল পাশে
মাঝখানে তার মৃত সৈনিক যেন
মত্ত বানর আসে।

এবং যখন পার হয় গ্রাম গঞ্জ
সৈনিকটিকে দেখবে কার সে সাধ্য
এত ভিড় হলো এত লোক এল দৌড়ে
আহা ওহো আর জিঙ বুম বুম বাদ্য!

তার চার পাশে এত লোক নাচ জুড়ল
দেখাই গেল না কোনো দিক থেকে তাকে।

শুধু দেখা যেত তাকালে ওপর থেকে
যেখানে তারারা পৃথিবীতে চেয়ে থাকে।
কিন্তু তারারা চিরকাল চেয়ে থাকে না
অল্পপরেই ভোর হয় পৃথিবীতে।
তবু সৈনিক, যেমন সে শিখেছিল
বীরের মৃত্যু পেবেছিল জিতে নিতে।

আশিস মজুমদার

মানবধর্ম

মাথার জোরে মানুষ বেঁচে থাকে
মাথাই তবু যথেষ্ট নয় বটে।
খুব বড়ো জোর দেখতে পাবে উকুন
তাকাও যদি নিজের নিজের জটে।

কেননা আজ যে-দুনিয়ায় আছি
কেউ সেখানে যথেষ্ট নই চতুর।
লক্ষ করে দেখিনি কক্ষনো
ভাঁওতা এবং মিথ্যেতে সব ফতুর।

নিজের জন্য বানিয়ে নাও ছক
দুই চোখে যা লাগিয়ে দেবে ধাঁধা—
পরেই আবার পালটে বানাও নতুন
কিন্তু কোনো কাজেই লাগবে না তা।

কেননা আজ যে-দুনিয়ায় আছি
কেউ সেখানে যথেষ্ট নই পাজি।
তবুও যাকে মানবধর্ম বলো
ভিতরে তার কতই রত্নরাজি!

ভাগ্য এবং সুখের পিছে ধাও
কিন্তু তাকে দৌড়লে কি পাবে?

ধাইছে সবাই, ভাগ্য এবং সুখও
তাদের পিছে ধাইছে একই ভাবে।

কেননা আজ যে-দুনিয়ায় আছি
কেউ সেখানে যথেষ্ট নই নরম।
কাজেই যাকে মানবধর্ম বলো
ভাঁওতা সেটা, ভঙ্গি সেটা চরম।

সত্যি বলতে, মানুষ তো নয় ভালো-
কাজেই ওদের হাঁড়িতে দাও লাথি।
ঠিকমতো সে দুচার লাথি খেলে
হতেও পারে অল্পস্বল্প খাঁটি।

কেননা আজ যে-দুনিয়ায় আছি
কেউ সেখানে যথেষ্ট নই সৎ।
কাজেই এসো ঠাণ্ডা মাথায় সবাই
লাথিয়ে ভাঙি এ ওর হাঁড়ি-ঘট।

শঙ্খ ঘোষ

মানুষের জীবনপ্রকৃতির অপর্যাপ্ততা

মাথা খাটিয়েই মানুষেব বেঁচে থাকা
মাথাটাই শুধু তার যথেষ্ট নয়
তাকাও না, দেখো নিজেদেব মাথাগুলো
বড়োজোর কিছু উকুনের আশ্রয়।

যে জগৎটা আমাদের বাসভূমি
তার উপযোগী ধূর্ত তো কেউ নই
সকলই মিথ্যে সবই সে আসলে ধোঁকা
লক্ষ করি বা কই!

এমন একটা পরিকল্পনা কর
যা দেখে নিজেরই তাজ্জব বনা চাই
আবার একটা পরিকল্পনা কর
কাজে আসবে না কোনোটাই।
যে জগৎটা আমাদের বাসভূমি
তার উপযোগী নই কেউ বজ্জাতও
তবু আমাদের উন্নত জীবপ্রকৃতি
অপরূপ সব উপাদানসঞ্জাত।

সুখ আর সৌভাগ্যকে ধাওয়া কর
শুধু ছুটলেই পাবে না তাদের নাগালে
কারণ সবাই ছুটছে এবং সুখ আর সৌভাগ্য
ঠিক পিছনেই ছুটছে তাদের সমান তালে।

যে জগৎটা আমাদের বাসভূমি
তার উপযোগী কারোর নেই সে বিনয়
তবু আমাদের উন্নত জীবপ্রকৃতি
আসলে ধাপ্পা এবং নিছক অভিনয়।

মানুষ আদৌ ভালো নয় সুতরাং
লাথাও হাঁড়িতে তার
হয়তো তেমন লাথাতে পারলে সজোরে
মানুষ হিশেবে উন্নতি হবে তার।

যে জগৎটা আমাদের বাসভূমি
কেউ নই তার উপযোগী ভালো লোক
অতএব এসো অবিচল মনেপ্রাণে
পরস্পরের হাঁড়িতে লাথানো হোক।

আশিস মজুমদার

মারী ফারার-এর ভ্রূণহত্যা সম্পর্কে

মারী ফারার, জন্ম এপ্রিল মাসে
কোন জন্মচিহ্ন নেই, অপ্রাপ্ত বয়স্ক!
পিতৃমাতৃহীন অনাথ
এ পর্যন্ত কোনও পুলিশ রেকর্ড নেই।
জানা গেছে, মেয়েটি নিম্নলিখিত
উপায়ে ভ্রূণ হত্যা করেছে :
তাব জবানীতে জানা যায়
যখন তার দ্বিতীয় মাস,
তখন মদের দোকানের এক ঝি-র সাহায্য নিয়ে
সে দুবার ডুশ নিয়েছিল, যাতে বাচ্চাটা পেট থেকে বেরিয়ে যায়।
জানা গেছে,
তাতে সে কষ্ট পেয়েছিল
কিন্তু কোন ফল অর্শায় নি।
কিন্তু মশাই, আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান,
কেননা যে জন্মেছে,
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারারের জবানী :
সে চুক্তিমত পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেয়
বুক আর পেট আঁট ক'রে বাঁধতে থাকে
মদের সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে খেতে শুরু করে
তাতে শরীরের মোক্ষণ হতে থাকে
কিন্তু শিশু বেড়েই চলে
বাসন ধুতে ধুতে তার শরীর যেন আর বয় না।
এখন এক নজরেই বোঝা যায়
পেটে কোন গোলমাল
মেয়েটি স্বীকারোক্তি করে
তখনও সে অপ্রাপ্তবয়স্ক
দেবতার কাছে রোজ সে ভক্তিভরে প্রার্থনা শুরু করে
কিন্তু মশাই, আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান

কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

প্রার্থনায় ফল হয় নি
সে সাহায্য চেয়েছিল
একদিন সকাল বেলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল,
যখন হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছিল
তখন দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছিল তার।
দশমাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত
সে তার গোপন কথা গোপনেই রেখেছিল ;
কেউ বিশ্বাস করতে পারতো না
এমন ঘটতে পারে,
এমন সাদামাটা মেয়েটার শরীর
এমন প্রলোভনেব শিকাব হতে পারে,
কিন্তু মশাই, আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান,
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারারের জবানবন্দী :
সেই বিশেষ দিনটি এল,
তখন সকাল
সে সিঁড়ি ধুচ্ছিল,
হঠাৎ কে যেন একটা লম্বা পেরেক
তার তলপেট দিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দিল
যন্ত্রণায় তার শরীর মোচড় দিয়ে উঠল,
তখনও সে গোপন কথা গোপনই রাখল।
সারাদিন কাপড় ধুতে থাকলো
আর মাথার মধ্যে দাপাদাপি চলতে লাগল।
তার মাথা ভার হয়ে এলো
পেটে বাচ্চা, বুক ভারী
অনেক রাতে বিছানায় গিয়ে এলিয়ে পড়ল।
কিন্তু মশাই, আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান,

কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

শোওয়া মাত্রই আবার কাজের তলব এলো।
বাইরে বরফ পড়ছে
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো মেয়েটা,
বাত এগারটায় কাজ শেষ।

বড় দীর্ঘ পরিশ্রান্ত দিন শেষ হলো।
পেট ছিঁড়ে বেবোবার জন্য ছটফট করছে বাচ্চাটা।
মারী ফারারের জবানবন্দী থেকে :
বাচ্চাটা জন্মালো, আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই দেখতে তাকে

কিন্তু মারী ফারার পাঁচটা মায়ের মত নয়।
ঘেন্না করবেন না,
ছেলের জন্ম দিয়েছে যে-মা,
সে মা নয়ই বা কেন?
কিন্তু মশাই, সাবধান
রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

যা বলছিলাম বলি,
যে ছেলে জন্মালো, তার কি হল বলি ;
মারী ফারারের জবানবন্দী :
এখন আর সে গোপনকথা গোপন রাখতে চায় না
কাজেই মশাইরা, বাকিটা শুনুন,
শুনে রায় দিন
সবে সে বিছানায় গিয়ে উঠেছে
ঘরে সে একা
সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে
জানে না কি হবে,
গোঙানি থামানোর জন্যে সে মুখে বালিশ চাপা দিল
আর আপনারা সব মশাইগণ, রাগ ঘৃণাকে আটকান

কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

ঘরে কনকনে শীত
তাই শেষ জোরটুকু সংহত করে
ও নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাথরুমে
যতটা আদর করে সম্ভব
বাচ্চার জন্ম দিলো,
কখন জানে না
বোধহয় ভোরের দিকে
বাথরুমের খোলা ছাদ দিয়ে বরফ পড়ছে
কি করে বাচ্চাকে ঢাকবে মা জানে না।
ঠাণ্ডায় হাতের আঙুল জমে আসছে, নীল হয়ে আসছে
কিন্তু মশাইগণ, সাবধান
রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারার বলছে :
বাথরুম থেকে ঘরে যাবার পথে
বাচ্চাটা কেঁদে উঠলো
চিল-চিৎকার,
ভয়ে পাগল হয়ে মারী তাকে কিল, চড়, ঘুষি মারতে লাগল
থেমে গেল বাচ্চা।
থেমে যাওয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে মারী তার বিছানায় ফিরল
সারা রাত বুকে বেঁধে রাখলো শরীরটাকে
সকাল বেলায় আস্তাবলের নিচে
ঘুম পাড়িয়ে দিল।
মারী ফারার, জন্ম এপ্রিল মাসে
কুমারী মা, শাস্তি পেয়ে জেলে মারা গেল
যে সমস্ত মানুষের পাপ বহন করছে!
ফর্সা চাদরের নিচে ডাক্তারের ছুরি কাঁচির সাহায্যে
যাঁরা সন্তানের জন্ম দেবেন
তাঁরা পুণ্যবতী জননী আখ্যা পাবেন

পুণ্যবান পিতৃবৃন্দ,
পুণ্যবতী মা জননীরা,
সাদামাটা একটা মেয়ে কামনার শিকার হয়েছিল
তাকে কুলটা বলবেন না,
তার পাপ ভয়ঙ্কর
যন্ত্রণা আরো বেশি
সুতরাং মশাইরা, সব রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জম্মানোদের সাহায্য চায়।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেয়া চক্রবর্তী

প্রেমিকেরা

দেখে বন্য বলাকার ঝাঁক ঐ উধাও বিরাট বৃত্তে।
মেঘমালা পিছে তারা ফেলে যায়, পেলব কোমল
সেই মেঘেরাই ভেসে ভেসে চলে তাদেরই পাখার ছন্দে
যখন উড্ডীন তারা পুরানো জীবন ফেলে অন্য এক খোঁজে।
ওরা দুই দল উড়ে চলে একই উর্ধ্বতায় আর একই বেগে,
মনে হয়, যেন কোনো উভয়ত প্রাসঙ্গিকতায়।
থাকে থাকে মেঘ আর বন্য পাখি এভাবে যে ওড়ে
মধুময় আকাশের মিলিত সম্ভোগে, ক্রমান্বয়ে ক্ষিপ্র অতিক্রমে!
কোনো দলে থমকায় না কেউ কোনোখানে কোনো ফাঁকে,
কোনো দিকে তাকায় না ফিরে, শুধু পরস্পরে দেখে পরস্পর
আন্দোলিত কীভাবে বাতাসে, প্রত্যেকেই বোঝে অনুভবে
বাতাসও তাদের গায়ে গায়ে চলে, যেমন তারাও সান্নিধ্যে উড্ডীন।
সুতরাং যতই-না বাতাস তাদের শূন্যে ঠেলা দেয়,
তারা যদি কেউই না বদলায় কিংবা ছত্রভঙ্গ হয় নাকো,
ততক্ষণ তাদের অঙ্গ যে স্পর্শ করবে এত শক্তি কারো নেই,
ততক্ষণ তারা শুধু বিতাড়িত দুনিয়ার সব ঠাঁই থেকে
যেখানেই ঝড় কিংবা গোলাগুলি তোলে প্রতিধ্বনি।

তাইতো সূর্যের আর চাঁদের অভিন্নপ্রায়, প্রায় একাকার
মুখের তলায় তারা উড়ে চলে পরস্পর মিলে পরস্পরে।
যায় কোথা?—কোথাও না। কার থেকে, কী থেকে পালায়?
—তোমাদের সকলের।

বিষ্ণু দে

এক তরুণীর উদ্‌ঘাটন

সংযত বিদায়দৃশ্য সকালবেলার, এক নারী
চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, ঠাণ্ডা, লক্ষ করি অচঞ্চলতায়,
দেখলাম : একগুছি চুল শাদা হয়ে গেছে তার
আর ধার্য করলাম এখন কী করে যাওয়া যায়

নিঃশব্দে নিলাম তার স্তন যেই আমাকে শুধালো
রাতের অতিথি আমি তবু রাত্রি শেষ হয়ে গেলে
বিদায় নিই নি কেন, এরকম বুঝি কথা ছিল!
অলজ্জিত তাকালাম, আর তাকে বলে ফেললামই :

আর শুধু একরাত্রি থাকব করেছি অভিপ্রায়
তোমার সময়টুকু চরিতার্থ করো এ-সুযোগে
বয়সের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তুমি এটা খুব খারাপ ব্যাপার
আমাদের কথাবার্তা এসো দ্রুত সেরে ফেলি প্রায়
কারণ ভুলেছিলাম বেলা বয়ে চলেছে তোমার,
বলতেই আমার স্বর বুজে আসে লোভের হুজুগে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রিয়াকে নিয়ে

জানি আমি, প্রেয়সীরা : আমার উদ্দাম জীবনের জন্য
ঝরে যাচ্ছে চুল আর আমাকে ঘুমোতে হয় পাথরের
ওপর। দেখো আমি সবচেয়ে শস্তা মদ খাই আর নগ্ন হয়ে
হেঁটে যাই হাওয়ায় হাওয়ায়।
কিন্তু একটা সময় ছিল, প্রেয়সীরা, যখন আমিও ছিলাম শুদ্ধ।
আমারও ছিল এক নারী, আমার চেয়েও তার জোর ছিল
বেশি, যেমন ষাঁড়ের চেয়ে অনেক সমর্থ হলো ঘাস :
আবার দাঁড়িয়ে ওঠে সে।
সে দেখল আমি এক বদমাশ, আর ভালোবেসে ফেলল আমাকে।
প্রশ্ন করেনি সে এপথ কোথায় নিয়ে যাবে, কী বা তার পথ, হয়তো-বা তা
পাহাড়ে গড়িয়ে যাবে। যখন সে দেহদান করল আমাকে,
বলল সে : এই-ই সব। তারই শরীর হলো আমারও শরীব।
এখন সে কোথাও নেই, বৃষ্টির পরে মেঘের মতো গেছে সে মিলিয়ে,
যেতে দিলাম আমি আব সে তলিয়ে গেল নিচে,
কেননা সেই-ই তার পথ।
কিন্তু রাত্রিবেলা, কখনো কখনো, যখন আমাকে তোমরা
পানরত দেখো, আমি দেখি ওর মুখ, বাতাসে পাণ্ডুর, দৃঢ়,
ঘোরানো আমার দিকে, আব আমি ওকে সম্ভ্রম জানাই এই
হাওয়ায় হাওয়ায়।

শঙ্খ ঘোষ

নিমজ্জিতা মেয়েটি

জলে ডুবে গেল, ভেসে গেল খরস্রোতে
পেরিয়ে ঝরনা, ঢেউ উত্তাল নদীতে—
আকাশে সূর্য উজ্জ্বল নীলমণি
যেন তিনি চান ওই মৃতদেহ জুড়োতে।

শরীরে জড়ালো শ্যাওলা, সাগর-পানা
ক্রমশই ভারী হয়ে এলো সেই শরীর
দুপায়ের ফাঁকে ভেসে যায় কত মাছ
শেষ যাত্রায় প্রাণী ও ঝাঁঝির বাধা বার বার জড়ায়।

সন্ধ্যা আকাশ ধোঁয়ার মতন কালো
রাত্রে তারার আলো হয়ে এল অনড়
তবুও বিকেলে ছিল স্বচ্ছতা, নীলিমার নীল দিন
আরও কিছু ভোর এবং সন্ধ্যা এখনও রয়েছে সামনে।

যখন পচন শুরু হলো তার ম্লান দেহটিতে, জলে
খুব ধীরে ধীরে ঈশ্বর তাকে অনায়াসে ভুলে গেলেন।
প্রথমে মুখটি, তার পরে হাত, সব শেষে তার চুল
এখন সে শুধু পচা গলা মাস, নদীতে অন্য পচা মাংসের মতন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অভিযাত্রীদের গাথা

রৌদ্রক্লিষ্ট, বিপর্যস্ত বর্ষাতে,
অপহৃত জয়মাল্য, সাথে, তার ভয়াল কেশ ছিন্ন,
সে ভুলে গেছে তার যৌবনকে, ভোলে নি তার স্বপ্ন,
আকাশকে নয়, ভুলে গেছে কোন ছাদের নিচেতে জন্ম।

ওগো তুমি, বহিষ্কৃত স্বর্গ হতে, নরক হতে,
ওগো খুনি, জর্জরিত মর্মঘাতী দুঃখে,
কেন তুমি মাতৃগর্ভে আর একদণ্ড থাকলে না,
যেখানে ছিল নির্জনতা, ঘুমিয়েছিলে শান্তিতে?

তবু সে খুঁজছে আজো অ্যাবসানথের সমুদ্রে,
যদিও মা তার ভুলে গেছে তার মুখের ছবি,
বিদ্রূপ আর অভিশাপ, কখনো বা অস্ফুট ক্রন্দন,
তার মাঝে সে খুঁজে চলে আরো সুখের দেশ।

নরকপথে হেঁটে, এবং স্বর্গে নিপীড়িত,
নীরব তবু বিকৃত সেই মুখ হয় নিরুদ্দেশ,
মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে সে ছোট্ট সবুজ মাঠের,
আর কিছু নয় আর একটি সুনীল আকাশের।

দীপেন্দু চক্রবর্তী

মাকে নিয়ে

যন্ত্রণা শুরু হবার আগে তার মুখের রেখা মনে আনতে পারি না আর এখন।
ক্লান্তভাবে, হাড়জাগা কপাল থেকে পিছনদিকে সরিয়ে দেন কালো চুলের
ধারা, আজও যেন দেখতে পাই সে-সময়ের হাত।
এক কুড়ি শীত তাঁকে ত্রস্ত করে গেছে, দুঃখ তাঁর অক্ষৌহিণী, কাছে আসতে
লজ্জা পেত যম। তারপরে মৃত্যু হলো, আর ওরা টের পেল ওঁর শরীরটা নিতান্ত
এক শিশুর মতো যেন।
বেড়ে উঠেছিলেন উনি অরণ্যে।
মুমূর্ষু ওঁর মুখের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থেকে কঠিন হলো যে-মুখগুলি,
তাদেরই মাঝখানে উনি মারা গেলেন। ওঁর দুঃখ ভেবে ওঁকে ক্ষমা করল
লোকে, কিন্তু উনি ধ্বসে যাবার আগে কেবল তাকিয়ে ফিরছিলেন ওসব মুখে
মুখে।
অনেকেই আছেন যাঁরা ছেড়ে গেলেন যাঁদের আমরা বাধা দিইনি। যা-কিছু
বলার ছিল বলেছি তা সবই, আমাদের মাঝখানে আর কিছু নেই, কঠোর
হয়েছে মুখ আমাদেরও বিদায়ের কালে।
জরুরি অনেক কথা কেন-বা বলিনি হায়, কতই সহজ হতো সেটা, কিন্তু আমরা
হতভাগ্য কখনো বলিনি। সহজ যে-কথাগুলি, এসেছিল ঠোঁটের ডগায়, হাসতে
গিয়ে পড়ে গেল তারা, আজ তারা দম বন্ধ করে দেয় আমাদের।
এবার মারা গেলেন আমার মা, গতকাল সন্ধের দিকে, পয়লা মের দিনে।
কেউ আর নখ দিয়ে খুঁড়ে আনতে পারবেই না ওঁকে।

শঙ্খ ঘোষ

তৃতীয় স্তব

জুলাইয়ের দুপুরে তোমরা পুকুরে ছিপ ফেলে তুলে আনো
আমার কণ্ঠস্বর।
আমার শিরায় তীব্র মদিরাধারা, মাংসল দুই হাত।
দিঘির জলে ভিজে ভিজে আমার চামড়া এখন তামাটে,
বাদাম ডালের মতো মজবুত আমার শরীর
রমণীরা জেনে নাও আমি উত্তম শয্যাসঙ্গী।

রক্তিম সূর্যালোকে পাথরের উপর শুয়ে
বাজাতে ভালোবাসি গীটার,
পশুদের অন্ত্র দিয়ে তৈরি সে যন্ত্রের তার,
গীটারটা তাই বেজে ওঠে জন্তুরই মতো, আর
টুকরো গানের কলিগুলিকে কড়মড়িয়ে চিবোয়।

জুলাইয়ের দিনে আমার সঙ্গে প্রণয়খেলা আকাশের,
তার নাম রেখেছি ছোট্ট ছেলে নীল,
উজ্জ্বল বেগ্‌নি রঙের শরীর,
আমার প্রতি আসক্তি তার, সেটা পুরুষ-প্রেম।
অথচ সে বিবর্ণ হয়ে ওঠে যখন আমি সেই
পশু-অন্ত্রকে নিষ্পেষণ করে চলি
আর বিস্তীর্ণ ক্ষেতের লাম্পট্যের নকলে মেতে উঠি
এবং রমণরত গাভীদের শীৎকার বেজে ওঠে
আমার গীটাবে।

সমীর দাশগুপ্ত

আমার মা-কে

যখন তিনি ফুরিয়ে গেলেন শেষে
আর ওরা তাঁকে কবরে শুইয়ে দিল,
ফুটে-ওঠা ফুলের আর প্রজাপতির ঝাঁকে
গুঞ্জরিত সেই পরিবেশ
তাঁর দেহ এত ক্ষীণ যে মাটিতে সামান্যই
চাপ পড়েছিল।
ভাবি, কতটা যন্ত্রণা তাঁকে অতটা নির্ভার
করে দিয়েছিল!

সমীর দাশগুপ্ত

রচনাকাল

১৯২৯–১৯৩৮

ভাবীকালের মানুষদের কাছে

সত্য বটে আমি আছি অন্ধকার যুগে।
অপকট কথা আজ অদ্ভুত শোনায়। আজ প্রসন্ন মুখের অর্থ
নির্মম হৃদয়। আজ যে হাসতে পারে
সে বুঝি-বা শোনেনি এখনও
ভীষণ সব সংবাদ।

আমাদের এ কী যুগ!
যখন গাছপালার কথা বলা প্রায় একটা অপরাধ,
কারণ তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তো একরকম নীরবতাই বটে।
আর আজ পথে-ঘাটে যে লোক চলতে পারে শান্ত, স্থির ভাবে,
সত্যই সে আছে তার দুঃস্থ অসহায়
বন্ধুদের নাগালের বাইরে।

কথাটা সত্য যদি বলো : আমি খেটে খাই,
কিন্তু সেটা নিতান্তই একটা দৈবাৎ ঘটনা।
আমার জীবিকা যাই হোক, তাতে আমার বাঁচার অধিকার বর্তায় না।
বেঁচে থাকাটাই একটা আকস্মিক ব্যাপার (কপাল যদি ভাঙে তবেই গিয়েছি)।

ওরা বলে : খাও-দাও। খুশি থাকো খেতে-দেতে পাচ্ছ ;
কিন্তু কী ক'রেই বা মুখে খাই-দাই
যখন আমার অন্ন ক্ষুধার্তের মুখ থেকে ছিনিয়ে জোগাড় করা
যখন আমার জলের গেলাশে তৃষিতের অধিকার!
তবু খাই-দাই।

আমিও তো প্রাজ্ঞব্যক্তি হতে চাই ;
প্রাচীন পুঁথিতে লিখেছে প্রজ্ঞা কি বস্তু :
বিশ্বের যা-কিছু দ্বন্দ্বময় তার থেকে দূরে থাকো, কাটাও তোমার আয়ুটুকু
কাউকে ভয় না-ক'রে,
হিংসাপ্রয়োগ বিনা,
যা সৎ ফিরিয়ে দাও অসৎকে হাতবদলে ;
আকাঙ্ক্ষার তুষ্টি নয়, বিস্মৃতিতে
প্রজ্ঞার সাধনা—

এর কিছুই আমার সাধ্য নয় :
সত্য বটে, আমি আছি অন্ধকার যুগে।

শহরে আমার আসা বিশৃঙ্খলার সময়ে
যখন ক্ষুধাই রাজা।
মানুষের মধ্যে আমার আসা যে গণ-উত্থানের লগ্নে,
আর আমিও বিদ্রোহী।
তাইতো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।

আমার খাওয়া সারতে হয়েছে হত্যাতাণ্ডবের ফাঁকে ফাঁকে,
আমার ঘুমের উপরে পড়েছে খুনখারাবির ছায়া,
আমার প্রেমের মধ্যে তাইতো এসেছে ঔদাসীন্য।
নিজের স্বভাবে আমি বোধ করেছি অধৈর্য।
তাইতো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।

আমাদের কালে পথের শেষ হয় চোরাবালিতে।
আমার বাকশক্তিই আমায় ধরিয়ে দিয়েছে কসাইদের হাতে।
অল্প আমার ক্ষমতা। কিন্তু আমি না-থাকলে
শাসকেবা আরো নিশ্চিন্ত হ'ত। এই অন্তত ছিল আমার আশা।
তাইতো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।

তোমরা যারা বেরিয়ে আসবে এ-বন্যা থেকে
যাতে আমবা ডুবছি,
তবে দেখো,
যখন তোমরা আমাদের দোষত্রুটির হিশাব করবে, তখন
ভেবো এই অন্ধকার যুগের কথাও।
যার জঠরের ব্যথায় এদের জন্ম।
কারণ আমরা দেশ পালটিয়েছি জুতার পাটির চেয়ে বেশিবার,
বাধ্য হয়ে, শ্রেণীসংগ্রামে, মরিয়া ব্যথায়,
যখন অন্যায় ছিল, ছিল না তার প্রতিরোধ।
কারণ আমরা ভালোই জেনেছিলুম

দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণায় ললাট হয়ে ওঠে
নির্মম কঠিন :
অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে-রাগ
তাতেই কণ্ঠ হয়ে ওঠে কর্কশ। হায় রে! আমরা
যারা প্রাণ দিতে গেছি দয়ামায়ার বনিয়াদ গড়বার জন্য,
আমরা নিজেরা দয়ামায়া রাখতে পারিনি।
তবুও, তোমরা, যেদিন শেষটায় সহজ হবে
মানুষের পক্ষে সব মানুষকে হাত এগিয়ে দেওয়া,
সেদিন তোমরা আমাদের বিচার কোরো না
খুব একটা কর্কশতায়।

বিষ্ণু দে

উত্তরপুরুষের প্রতি

১
সত্যি আমার দিন কাটছে অন্ধকার কালে।
অকপট কথামাত্রই যখন হাস্যকর। মসৃণ ললাটে ঘোষিত
কঠোর হৃদয়। যে-ব্যক্তি হাসে
সে এখনো শোনেনি
ভয়ংকর খবর সব।
কী বিচিত্র এই কাল!
গাছপালার কথা বলাও যেন অপরাধ
যেহেতু তা অবিচারের বিপক্ষে একরূপ নীরব উত্তর।
আর যে-ব্যক্তি শান্ত পায়ে রাস্তায় হেঁটে চলে,
সে কি তার বিপর্যস্ত বন্ধুদের
ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়?

এ কথা অবশ্য ঠিক : আমি জীবিকা অর্জন করি
কিন্তু, দেখ, সেটা একেবারেই আকস্মিক ব্যাপার।
আমি যে-কাজই করি তাতে আমার ভরাপেট খাবার অধিকার বর্তায় না।
বরাতের ফেরে আমি টিকে গেছি (ভাগ্য আমাকে ত্যাগ করলে আমিও শেষ)।

লোকে বলে : খানাপিনা ক'রে যাও, পাচ্ছ খুশি থাকো।
অথচ কী ক'রে বল মুখে তুলি
যে-খাবার ছিনিয়ে আনা ক্ষুধিতের গ্রাস থেকে
আর যে-জলের পাত্রে তৃষ্ণার্তের অধিকার?
অথচ তো খাই দাই সবই ঠিক মতো।

জ্ঞানী হতে পারলে আমারও ভালোই লাগত।
প্রাচীন পুঁথিতে বলেছে প্রজ্ঞা কী জিনিশ :
দুনিয়ার ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখো, তোমার সামান্য আয়ুটুকু কাটিয়ে,
কাউকে ভয় না ক'রে,
হিংসাকে বর্জন ক'রে,
ভালোকে এগিয়ে দিয়ে মন্দের বিনিময়ে—
বাসনার তৃপ্তিকে নয়, বিস্মৃতিকে
বলা হয়েছে প্রজ্ঞা।
আমি কিন্তু দেখ এসব কিছুই পারিনা :
সত্যি আমার দিন কাটছে অন্ধকার কালে !

২
শহরে আমি এসেছিলাম বিশৃঙ্খল দিনে
যখন রাজত্ব চালাচ্ছিল ক্ষুধা।
মানুষের মধ্যে আমার আসা এক উত্থিত সময়ে
আর তাদের হাত ধ'রে বিদ্রোহ করেছি আমিও।
এই ভাবে সময় ফুরিয়ে গেছে
পৃথিবীতে যেটুকু ছিল আমার ভাগে রাখা।

আমার আহার সারতে হয়েছে হত্যাতাণ্ডবের ফাঁকে ফাঁকে।
নরবলির ছায়া পড়েছে আমার ঘুমের উপর।
যখন আমি ভালোবেসেছি, ঔদাসীন্যে সে-ভালোবাসা ভরেছে।
নিসর্গের প্রতি আমার মন হয়েছে অধৈর্য।
এইভাবে সময় গেছে ফুরিয়ে
পৃথিবীতে যেটুকু ছিল আমার ভাগে রাখা।
আমার সময়ে প্রতিটি রাস্তা শেষ হয়েছে কোন চোরাবালিতে।
আমার কথাবার্তাই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে খুনীর হাতে।
অল্পই অবশ্য আমার সাধ্য ছিল, তবু শাসকের দল

আমি না থাকলে আরো নির্বিঘ্ন হবে, এই ছিল আমার আশা।
আর এইভাবে ফুরিয়েছে আমার সময়
জীবনে যেটুকু আমার ভাগে ছিল দেয়া।

৩

কিন্তু তোমরা যারা এই বন্যার ভিতর থেকে আসবে
যে-বন্যায় আমরা ডুবে যাচ্ছি,
একবার ভেবে নিও—
আমাদের অক্ষমতার কথা যদি কখনো বল,
তখন ভেবে নিও এই অন্ধকার কালের কথাও একবার
যা সেই অক্ষমতার বাহক।
কারণ আমরা এগিয়ে গেছি, জুতোর চেয়েও বেশিবার দেশ পালটিয়ে,
... ...
কারণ আমাদের ঠিকই জানা ছিল :
দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণাতেও
ললাট ক্রমে পাথর হয়ে ওঠে।
এমন কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধও
কণ্ঠকে কর্কশ ক'রে তোলে। হায়রে আমরা
যারা ভিত গড়তে চেয়েছি মমতার,
নিজেরাই পারিনি দয়ামায়াকে ধ'রে রাখতে শেষে।

কিন্তু পরে একদিন যখন আসবে
যেদিন মানুষ মানুষকে দিতে পারবে তার হাত,
সেদিন আমাদের বিচার করতে ব'সে
খুব বেশি নির্মম হয়ো না।

সমীর দাশগুপ্ত

জেনারেল, তোমার

জেনারেল, তোমার ঐ ট্যাংকটা জব্বর গাড়ি বটে।
একটা অরণ্য ও ছারখার করতে পারে, ছাতু করতে পারে
একশো মানুষকে।
কিন্তু ওর একটি গলদ :
ওকে চালাবার জন্যে লাগে মানুষ।

জেনারেল, তোমার বোমারু বিমানটা জব্বর।
বাতাসের চেয়ে জোব ওর ছুট, ভার বইতে পারে হাতির
চেয়ে বেশি
কিন্তু ওর একটি গলদ :
মিস্ত্রিমজুরে ওর নির্ভর।

জেনারেল, মানুষ বেশ কাজের জীব।
সে উড়তে ওস্তাদ, সে মারতেও ওস্তাদ।
কিন্তু তার একটি গলদ :
সে ভাবতেও পারে।

বিষ্ণু দে

গলদ

হিংস্র এক শকট তোমার ট্যাঙ্ক, হে সেনানী।
অরণ্য করে ধ্বংস
আর শতজনকে করতে পারে দলিত।
কিন্তু একটিই তার ত্রুটি।
চালাবার কেউ তার চাই।

মহাবল তোমার বোমারু বিমান,
হে সেনানী!
ঝড়ের চেয়ে বেগে পারে উড়তে,
বইতে পারে হাতির চেয়ে বেশি বোঝা।

একটি শুধু তার খুঁত!
মিস্ত্রী একজন তার দরকার।

মানুষ বড় কাজের জীব
হে সেনানী!
উড়তে পারে, হত্যাও পারে করতে।
এই শুধু তার গলদ,
সে ভাবতে পারে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বই পোড়ানোর উৎসব

সরকার থেকে যখন হুকুম এল যে, বিপজ্জনক কথায় ভরা
বইগুলিকে পোড়াতে হবে প্রকাশ্যেই, আর সমস্ত জায়গায়
বইবোঝাই গাড়ি টানতে টানতে বলদগুলি চলল
চিতার দিকে, নির্বাসিত এক কবি,
প্রথম সারির একজন, পোড়ানো বইয়ের তালিকা দেখে
খেপে গেলেন, কেননা তাঁর বইগুলিকে
এরা ভুলে গেছে। রাগের ডানা ঝাপটে দৌড়োলেন তিনি লেখার টেবিলে
আর কর্তাদের কাছে লিখলেন এক চিঠি।
আমাকে পোড়াও, ঝড়ের বেগে লিখলেন তিনি, পোড়াও আমাকে।
এ কী ব্যবহার আমার সঙ্গে। ছেড়ে দিয়ো না আমায়।
আমি কি সবসময়ে সত্যই বলিনি আমার লেখায়? আর এখন
তোমরা আমাকে বানিয়ে তুলছ মিথ্যাবাদী! হুকুম করছি!
পোড়াও আমায়।

শঙ্খ ঘোষ

বই-পোড়ানো

যখন আমলাতন্ত্র হুকুম দিলেন সাংঘাতিক শিক্ষার বইপত্তর প্রকাশ্যে
পোড়ানো উচিত তখন সর্বত্র বলদগুলোকে বাধ্য করা হলো বোঝাই
গাড়িগুলো টানতে, টানতে টানতে যেখানে বহ্ন্যুৎসব—সেখানে,
একজন স্ব-নির্বাসিত কবি, বাজারের সেরা একজন, ক্রোধে আবিষ্কার
করলেন তালিকায় তাঁর কোন বই নেই—বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে
তাঁকে। আগুনের পাখায় উড়ে গেলেন তিনি তাঁর সাজানো টেবিলে,
ক্রোধের কলমে লিখলেন এক পত্র তাঁদের যাঁরা রয়েছেন ক্ষমতায়।
আমাকে পোড়াও, দ্রুত চলনে লিখলেন তিনি, পোড়াও আমাকে
আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করোনা ; ছেড়ে দিয়োনা আমাকে
আমি কি আমার বইগুলোতে চিরন্তন সত্যগুলি তুলে ধরিনি?
আর তোমরা এমন করছো আমার সঙ্গে যেন আমি মিথ্যেবাদী।
আমি আদেশ দিচ্ছি : আমাকে পোড়াও!

সাগর চক্রবর্তী

বই-পোড়ানো উৎসব

সরকার মহোদয় যখন বিপজ্জনক বইগুলোকে
প্রকাশ্যে দগ্ধ করার দিলেন আদেশ, সর্বত্র যখন
বলদটানা গাড়ি বোঝাই বই-এর স্তূপ
চলল চিতার দিকে ; নির্বাসিত এক কবি,
সাহিত্যকূলচূড়ামণি, জেনে ক্রুদ্ধ হলেন
যে তাঁর বইগুলো গেছে বাদ।
উষ্মার পাখায় ভেসে গেলেন লেখার টেবিলে,
ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্যে লিখলেন এক পত্র।
পোড়াও আমায়, ছুটন্ত কলমে লিখলেন কবি, আমায় পোড়াও।
এমন করে না, ছিঃ, আমায় বাদ দিতে নেই।
আমার বইয়ে সদাসর্বদা বলেছি সত্য কথা,
আর কিনা আজ আমায় মিথ্যাবাদী বলো?
আদেশ দিচ্ছি : পোড়াও আমায়।

[illegible]

মজুরের চোখে ইতিহাসের কেতাব

কারা গড়েছিল থিবিস নগরীর সাত সাতটি প্রবেশদ্বার?
ইতিহাসের কেতাবে লেখা হরেক রাজার নাম
কিন্তু বড় বড় চাঙড়গুলো ঠেলে ঠেলে তুলেছিল যারা
তারা কি রাজা ছিল?

ধ্বংস হোল ব্যাবিলন,
কিন্তু প্রতিবার নূতন করে তাকে গড়ে তুলল যারা তারা কারা?
স্বর্ণ-ঝলকিত লিমা নগরকে গড়েছিল যারা
নগরীর কোন্ গৃহটিতে ছিল তাদের বাসস্থান?

যে-সন্ধ্যায় শেষ হোল চীনা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ
সে সন্ধ্যায় কোন আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছিল ক্লান্ত রাজমিস্ত্রীর দল?

সাম্রাজ্যিক রোম বিজয়তোরণে-তোরণে ভর্তি
কিন্তু সেগুলি গড়েছিল কারা?
কাদের বিজিত করেছিলেন সম্রাটেরা?

গানে-গানে অমর হয়ে আছে বাইজান্টিয়ম,
কিন্তু তার সব গৃহগুলিই কি ছিল রাজপ্রাসাদ?
যে-রাত্রে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে হঠাৎ প্লাবিত হোল
পুরাণকথিত আতলান্তিস নগরী,
সে রাত্রে, সেই দিশেহারা প্লাবনের মুখে দাঁড়িয়েও,
ডুবন্ত মানুষগুলো মালিকের মেজাজ নিয়ে ডেকেছিল
তাদের ক্রীতদাসদের।

তরুণ আলেকজান্দার জয় করেছিলেন ভারতবর্ষ।
জয় করেছিলেন কি তিনি একা?
সীজার মেরে তাড়িয়েছিলেন গল্‌দের।
কিন্তু একটি বাবুর্চিও কি ছিলনা তাঁর ফৌজে?

স্পেনের নৌবহর ধ্বংস হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেল
কেঁদে ভাসিয়েছিলেন স্পেনের রাজা ফিলিপ,
কিন্তু আর কেউ কি কাঁদেনি?

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন মহামতি ফ্রেডরিক।
আর কারা জয়ী হয়েছিল তার সঙ্গে?

ইতিহাসের পাতায় বিজয় কাহিনী,
কিন্তু বিজয়োৎসবের খরচ জুগিয়েছে কারা?

প্রতি দশ বৎসর অন্তর একজন করে মহাপুরুষের আবির্ভাব,
কিন্তু কাদের গাঁটের শেষ কানাকড়ি টেনে নিয়ে
তৈরি হয়েছিল এই মহাআবির্ভাব পথ?
মনে আসে এই ধরণের খুঁটিনাটি কথা,
এই ধরনের হাজারো রকমের প্রশ্ন।

সরোজ দত্ত

পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন

কে বানিয়েছিল সাত দরজঅলা থীবস? বইয়ে লেখে রাজার নাম।
রাজারা কি পাথর ঘাড়ে করে আনত?
আর ব্যাবিলন এতবার গুঁড়ো হলো, কে আবার গড়ে তুলল এতবার?
সোনা-ঝকঝকে লিমা যারা বানিয়েছিল তারা থাকত কোন বাসায়?
চীনের প্রাচীর যখন শেষ হলো সেই সন্ধ্যায় কোথায় গেল রাজমিস্ত্রিরা?
জয়তোরণে ঠাসা মহনীয় রোম।
বানাল কে? কাদের জয় করল সীজার?
এত যে শুনি বাইজেনটিয়াম, সেখানে কি সবাই প্রাসাদেই থাকত?
এমনকি উপকথার আটলান্টিস, যখন সমুদ্র তাকে খেল
ডুবতে ডুবতে সেই রাতে চিৎকাব উঠেছিল ক্রীতদাসের জন্য।
ভারত জয় করেছিল তরুণ আলেকজাণ্ডার।
একলাই নাকি?
গল্‌দের নিপাত করেছিল সীজার। নিদেন একটা রাঁধুনি তো ছিল?
বিরাট আর্মাডা যখন ডুবল, স্পেনের ফিলিপ কেঁদেছিল খুব।
আর কেউ কাঁদেনি?
সাত বছরের যুদ্ধ জিতেছিল দ্বিতীয় ফ্রেডারিক।

কে জিতেছিল? একলা?
পাতায়-পাতায় জয়
জয়োৎসবের ভোজ বানাত কারা?
দশ-দশ বছরে এক-একজন মহামানব।
খরচ মেটাতে কে?
কত সব খবর!
কত সব প্রশ্ন!

শঙ্খ ঘোষ

শ্রমিকের ইতিহাস পাঠ

কারা গড়েছিল সপ্তদুয়ার থিবিসের?
বইগুলো ঠাসা মহারাজাদের নামে।
রাজারা কি সব টেনে এনেছিল খাড়া পাহাড়ের চাঁই?
আর যতবার ভেঙে চুরমার ব্যাবিলন
ততবার তাকে গ'ড়ে তুলেছিল কারা সোনা ঝলমল
লিমা শহরের কোন্ ঘরে ছিল তারা, গড়েছিল তাকে যারা?

চীনের প্রাচীর গড়া শেষ ক'রে সন্ধেবেলা
চ'লে গেল সব কারিগরদল কোনখানে? রোম রাজ্যের
পথ ছেয়ে সব বিজয়তোরণ। কারা গড়েছিল? কাদের হারিয়ে
সিজারবংশ বিজয়ী হ'ল? বাইজেন্টিয়াম বেঁচে আছে গানে
সব বাড়ি তার ছিল কি প্রাসাদ? উপকথাতেও আটলান্টিসে
যে-রাতে সাগর এসেছিল ছুটে
সে-রাতে লোকেরা ডুবে যেতে যেতে হেঁকেছিল দাসদাসীকে।

আলেকজান্দার ভারতবিজয়ী যৌবনে।
একাই তিনি?
সিজার হারান গলজাতিকে,
ছিল না তাঁর সৈন্যদলে একটি পাচক?
স্পেনের ফিলিপ অশ্রু ফেলেন যখন দেখেন

রণতরী চূর্ণ হয়ে তলিয়ে যায়। আর কোনো চোখ ফেলেনি জল?
মহান ফ্রেডরিক সাত বছরের যুদ্ধ জেতেন। কারা
জিতেছিল তাঁর সাথে আর?
প্রতিটি পৃষ্ঠা একটি বিজয়,
কাদের হারিয়ে বিজয়স্তবক?
প্রতি দশকেই মহানমানব,
কারা পুষেছিল বংশীবাদক?

এত সব কথা খুঁটিনাটি,
এত জিজ্ঞাসা সারি সারি।

দীপেন্দু চক্রবর্তী

ঘুমপাড়ানি গান ১

তোকে যখন জন্ম দিলাম, ককিয়ে উঠেছিল
স্যাপের জন্য ভাইগুলো তোর, আমার তা ছিল না।
জন্মালি যেই পয়সা কোথায় বাতিঅলাকে দেব
তাই পেলি দুনিয়া থেকে অল্প আলোর কণা।

যখন বয়ে বেড়াচ্ছিলাম মাসের পর মাস
যা কথা তোর বাপের সঙ্গে সে তো তোকেই নিয়ে
ছিল না ফী দেবার টাকা ডাক্তারবাবুকে
সুন্‌সান রুটিতে একটু মাখন মাখতে গিয়ে।

প্রথমে যখন কোলে নিলাম, আমরা ততক্ষণে
রুজিরোজগার রুটির আশা দিয়েছি সব ছেড়ে
এক শুধু কার্ল মার্কস এবং লেনিনই জানতেন
কী আছে আমাদের মতো মজুরের তক্‌দিরে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দোলনার গান

যখন তোকে ধরেছিলাম পেটে
গোছ-গোছানো ছিল না মোটে কিছুই
বলেছি কত মাঝে মাঝেই, বইছি যারে আমি
আসছে সে এক নোংরা দুনিয়ায়।

তাইতো আমি দিলাম তুলে দেখাশোনার ভার
সে যাতে আর ভুল করে না পরে
বইছি যাকে নিজের পেটে, দেখতে হবে তাকে
সোনা আমার, থাকতে যেন পারিস দুধে-ভাতে।

দেখেছি আমি, দেখেছি ওদের কয়লাখনির মুখ
একটি বেড়ায় চারপাশটা ঘেরা
বলেছিলাম, পেটে যে আছে, সেই তো নেবে ভার
কয়লাগুলোর যা দিয়ে সে পাবে গরম, তাপ।

দেখেছি কত রুটির বাহার জানলাগুলোর ধারে
যা দিয়ে হয় পেটের ক্ষিদে দূর
ভেবেছি, পেটের ছেলেটাই তো, নেবে রুটির ভার
যা দিয়ে তার বাড়বে দেহখান।

যুদ্ধ বাঁধলে দাঁড়াবে সে বাপের পাশাপাশি
লড়াই থেকে আসবে না'ক ফিরে
বলেছিলাম, পেটের ছেলে চলবে দেখে শুনে
এখন বিপদ ঘটে না যেন নিজের।

যখন তোকে ধরেছিলাম পেটে
আপন মনে নিচু গলায় বলেছিলাম কত :
সোনা আমার, বইছি তোকে পেটে
তোর যেন হার হয় না কোনোমতে।

কৃষ্ণ ধর

চাষীর চিন্তা

চাষীর চিন্তা
শুধুমাত্র তার ক্ষেতকে ঘিরে,
গরুবাছুরের তদারকি,
ট্যাকসো মেটানো।
সন্তান উৎপাদন,
বিনা মুনিষে কাজ চালানো
আর দুধ বেচে
সংসার প্রতিপালন।

শহুরে বাবুদের মতে
চাষীদের নাকি জমি-অন্ত প্রাণ
তরতাজা তাদের স্বাস্থ্য
আর তারাই নাকি
জাতির স্তম্ভ।

আলবৎ,
এ সবই তাঁরা বলেন,
জমি-অন্ত প্রাণ চাষীদের
সতেজ স্বাস্থ্য তাদের
আর তারা
জাতির মেরুদণ্ড।
অথচ
চাষীর ভাবনায় আছে
শুধু তার জমিটুকু,
গরুবাছুরের খবরদারি,
ট্যাকসো গোনা,
সন্তান জন্মানো,
কী করে বাঁচবে মুনিষের খরচ,
কী করে চলবে সংসার
দুধ বিক্রির পয়সায়।

বেলা দত্তগুপ্ত

চাষাড়ে ব্যাপার

১
চাষার যতো মেঠো ব্যাপার,
দুধেল গাইয়ের তদারকি, খাজনা দাদন
খাটাখাটনি সামাল দিতে বছর বছর বাচ্চা বিয়োন,
দুধের দামের নামা-ওঠায় মরণ বাঁচন।

শহুরে লোক উচ্চকণ্ঠে মাটির কথা ব'লে থাকেন,
গাঁ-গেরামে গতরখাটা ওদের কথা ব'লে থাকেন,
আরো বলেন ওরাই হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি দেশের মাথা।

২
শহুরে লোক উচ্চকণ্ঠে মাটির কথা ব'লে থাকেন,
গাঁ-গেরামে গতরখাটা ওদের কথা ব'লে থাকেন,
আরো বলেন ওরাই হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি দেশের মাথা।

চাষার যতো মেঠো ব্যাপার,
দুধেল গাইয়ের তদারকি, খাজনা দাদন
খাটাখাটনি সামাল দিতে বছর বছর বাচ্চা বিয়োন,
দুধের দামের নামা-ওঠায় মরণ বাঁচন।

শোভন মিত্র

জোট বাঁধবার গান

এবং যতক্ষণ রক্তেমাংসে মানুষ
চাইবে রুটি মাংস, কিছু মনে করো না,
এবং ফাঁকা বুলি যথেষ্ট নয়, কারণ
বুলি খেতে আদৌ ভালো না।

তবে বাম দুই তিন! বাম দুই তিন তবে!
কমরেড দেখো এই তো তোমার স্থান।

সামিল হও তাই শ্রমিকদলের জোটে,
কারণ তুমি নিজেও শ্রমজীবী।

এবং যতক্ষণ রক্তেমাংসে মানুষ,
ঝ'রে পড়ার আগে তাকে তাড়ায় কে।
সে চাইবে না দাম পায়ের নিচে,
প্রভু মাথার টাকে।

তবে বাম দুই তিন। বাম দুই তিন তবে!
কমরেড দেখো এই তো তোমার স্থান।
সামিল হও তাই শ্রমিকদলের জোটে,
কারণ তুমি নিজেও শ্রমজীবী।

যতক্ষণ থাকবে দুটো দল
ঐক্যমত সকল সর্বহারা,
আর কারো নয়, শ্রমিকশ্রেণীর কাজ
শ্রমিক মুক্ত করা।

তবে বাম দুই তিন। বাম দুই তিন তবে!
কমরেড দেখো এই তো তোমার স্থান।
সামিল হও তাই শ্রমিকদলের জোটে,
কারণ তুমি নিজেও শ্রমজীবী।

দীপেন্দু চক্রবর্তী

ঝটিকাবাহিনীর গান

ক্ষিধেয় আমি ধুঁকছিলাম
পেটের মোচড়ে বিষণ্ন
চিৎকার ক'রে বললো কেউ
: ওঠো, দ্যাখো দেশ জাগ্রত!

দেখলাম আমি সজ্জিত
সৈন্যেরা করে কুচকাওয়াজ
যেহেতু আমার কিছুই নেই
হারাবার মতো—, আমিও তাই
ঐ সাথে চলি—যা হয় হোক!

আমিও করছি কুচকাওয়াজ
ওদের সঙ্গে মিলিয়ে তাল
': রুটি আর কাজ!' স্লোগান দিই
আমার সাথে সে লোকটাও।

নেতার পায়ে দামী জুতো
ন্যাংচাই আমি খালি পায়ে
তবুও করে যাই কুচকাওয়াজ
বেহায়া ক্ষুধাকে চড় মেরে।

বাম পথে আমি চলতে চাই
চল, দক্ষিণে!—আদেশ হয়;
অন্ধের মত মেনে চলি
ভালো বা খারাপ যা হয় হোক।

নতুন একটা পথ দেখি
কোথায় গিয়েছে জানিনা কেউ,
ভরা পেট আর ক্ষুধার্ত
মিছিলে মিলেছি একই সাথে।

ওরা তুলে দিল রিভলভার
: মারো আমাদের শত্রুকে!
যেমনি ছুঁড়েছি গুলি, দেখি
মাটিতে—রক্তে—আমারই ভাই!

সে আমার ভাই! ক্ষুধা পেটের
করেছিল এক দুজনকে।

এবং এখনো মিছিলে যাই
নিজের এবং সহোদরের
শত্রুর সাথে একই সাথে।

তাই হারিয়েছি সোদর ভাই,
তার কাফনের ঢাকা বুনি!
এখন জেনেছি এই জয়ে
নিজের খবর খুঁড়ি নিজেই!

সাগর চক্রবর্তী

ঝটিকাবাহিনীর গান

ক্ষুধার দাপটে ক্রমে ঝিমিয়ে পড়ি
জঠরের যন্ত্রণা আচ্ছন্ন করে মন।
তখন কে যেন আমার কানে ব'লে উঠল :
জর্মনি জেগে ওঠো!

তাকিয়ে দেখি অনেক লোক এগিয়ে চলেছে
তৃতীয় রাইখের দিকে—তারাই বলল।
যেহেতু কিছু হারাবার ভয় আমার ছিলনা
আমিও গেলাম তাদের পিছে পিছে।

আমি যতই পা ফেলে চলেছি, সে-ও হাঁটছে,
বিরাট উদর—আমার পাশে পাশে।
যখনই আমি চেঁচিয়ে উঠছি, "রুটি আর চাকরি",-
"রুটি আর চাকরি", সেও বলেছে।

মুরুব্বিদের পায়ে উঁচু বুটজুতো,
আমি হোঁচট খেয়েছি সিক্ত দুপায়ে,
তথাপি আমরা সবাই সমান কদমে
একসঙ্গে তাল রেখে রেখে গেছি।

যখনি ভেবেছি এবার বাঁদিকে ঘুরব,
ডান দিকে চল, অমনি শুনতে হ'ল।
চোখ বুজে আমি হুকুম নিয়েছি মেনে
তাতে ভালো হোক অথবা মন্দ আরো।
... ...

ওরা একটা পিস্তল এগিয়ে দেয়
বলে : এবার চালাও শত্রুর গায়ে গুলি!
কিন্তু যেই ওদের শত্রুদের গুলি ছুঁড়লাম
দেখি ঢ'লে পড়ল আমারই আপন ভাই।

আমারই ভাই বটে, পেটের জ্বালা
আমাদের ক'রে দিয়েছিল এক।
আর এখন পা চালিয়ে চলেছি চলেছি
আমার শত্রু আর আমার ভ্রাতার শত্রুর পাশে।
... ...

সমীর দাশগুপ্ত

যারা মুখের গ্রাস কেড়ে খায়

তারা শেখায়, সবকিছু ভাগ্য বলে মেনে খুশি হও।
যাদের পাহাড়প্রমাণ আয়ের জন্য
নানা কর হয়েছে নির্দিষ্ট,
তাদেরই দাবি সোচ্চার, বলে "ত্যাগ করো"।
পেট পুরে খায় যারা, তারাই শোনায় ক্ষুধিতদের
আগামী উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা।
যারা দেশকে নরকের পথে নিয়ে যায়,
তারাই বলে চিৎকার করে
দুর্বিনীত সাধারণ লোকগুলোর জন্যে
শাসন চালানো হয়ে পড়েছে বড়ো কঠিন।

অনুপম গুপ্ত

থালার থেকে রুটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে যারা

পরিতৃপ্তি শেখাও।
যাদের ওপর যখন তখন দফায় দফায় ট্যাকসো চাপে
তাদের কাছে হুকুম নামায় দাবী করো আত্মত্যাগের।
ইচ্ছেমতো খাদ্য খেয়ে ভরাপেটে বক্তিমে দেয় যেসব লোকে
অনাহারী দেশবাসীকে ডেকে বলে : সুদিন আসছে
দেশটাকে এই রাজ্যটাকে নিয়ে গেছে ঘায়ের রক্তে
তারাই বলে : দেশ চালানো চাট্টিখানি মুখের কথা?
তারাই বলে : সাধারণের হিতের জন্য সকাল বিকাল
দুপুর রাত্রি খেটে মরছি।

সাগর চক্রবর্তী

যারা পাতের মাছটুকু তুলে নেয়

যারা পাতের মাছটুকু তুলে নেয়
তারা আমাদের শেখাতে চায় তুষ্ট থাকার বিদ্যা।
যাদের পকেটে ঠিক ঢুকবে ট্যাক্সের টাকা
তারা দাবি করে ত্যাগ।
যারা দুবেলা পেট ভ'রে খায় তারা ক্ষুধিতকে শোনায়
অনাগত ভবিষ্যের অপরূপ কথা।
যারা দেশকে নিয়ে যায় পাতালের পথে
তারা বলে শাসনকার্য চালাতে খাবি খাবে
রাম শ্যাম আর যদুর মতো লোক।

সমীর দাশগুপ্ত

শিশুদের জন্য গান, উল্‌ম ১৫৯২

বিশপ, আমি উড়তে পারি
বললে দর্জি বিশপকে।
কেমন করে আপনি খালি দেখতে থাকুন।
এই বলে সে তড়বড়িয়ে উঠতে থাকল
জিনিস নিয়ে, ডানার মতই দেখতে লাগল,
চওড়া চওড়া অনেক চওড়া গির্জেবাড়ির ওপর ছাদে।
বিশপ চলে গেলেন বাড়ি
কথাটা যে মিথ্যে ভারী
মানুষ তো আর পক্ষী না
দেবে না কেউ কক্ষনো না শূন্যে পাড়ি।

দর্জিব্যাটার দফারফা।
বললে লোকে বিশপকে।
পাখনাগুলো চটকে গেছে
শরীরটা ওর জোর ঠুকেছে
শক্ত শক্ত ভীষণ শক্ত পাথরগাঁথা চাতালটায়।
ঘণ্টাটাকে দাও বাজিয়ে চূড়োর মাঝে
কথাটা যে মিথ্যে ভারী
মানুষ তো আর পক্ষী নয়
দেবে না কেউ কক্ষনো না শূন্যে পাড়ি
বললে বিশপ লোকের কাছে।

শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়

ইস্টার দিবসে

**ইস্টারের ভোরে এই দ্বীপের উপর
ব'য়ে গেল অকস্মাৎ তুষারের ঝড়—
মুকুলিত ঝোপঝাড়ে তুষারের ফুল।
আমার কনিষ্ঠ ছেলে দেখায় আঙুল
আখরোট গাছটির দিকে।**

আমার লেখায় ছেদ পড়ে অকারণ—
যাদের বিরুদ্ধে আমি ধরেছি কলম
যারা যুদ্ধবাজ, যারা আজ
ধ্বংস করে এই মহাদেশ, এই দ্বীপটাকে
দেশবাসী, পরিবার এবং আমাকে।

আমরা নিঃশব্দে শুধু শীতে-কাঁপা গাছটির গায়ে
কেবল একটি থলে দিলাম জড়ায়ে।

দিনেশ দাস

নিষ্ফলা

ফল ধরে না যে-গাছে
লোকে বলে তাকে বাঁজা। কেউ কি
মাটিটা পরীক্ষা করে দেখেছিল একবার?

গাছের একটা ডাল খসে পড়লে হঠাৎ,
লোকে বলে আদতেই ওটা ছিল পচা।
কেউ কি জানে ওর গায়ে বাসা বেঁধে ছিল ঘন বরফ?

সমীর দাশগুপ্ত

প্লামগাছ

বাগানে দাঁড়িয়েছিল ছোট প্লামগাছ
এতো ছোট ভাবতে পারবে না।
যেহেতু রয়েছে বেড়া চারিদিকে ঘিরে,
কেউ তাকে মাড়িয়ে যাবে না।

কোনদিন আরো বড়ো হবে না, যদিও
হ'তে চায় বড়ো হ'তে চায় ;
কোন সম্ভাবনা নেই, সেই প্লামগাছ
এতো কম আলো কাছে পায়।

তাকে প্লামগাছ ভাবা খুব কষ্টকর
কোন ফল হয় নি কখনো।
যদিও সে প্লামগাছ-ই ব'লে দিতে পারো
পাতা তার দেখলে যে-কোন।

আলোক সরকার

প্রতিমূর্তির বদলে পেট্রোলিয়াম

কমরেড লেনিনকে
জানিয়েছে সম্মান
কত লোক
কত ভাবে
প্রতিমূর্তি গড়া হয়েছে তাঁর কত
পূর্ণাবয়ব এবং আবক্ষ
কত অসংখ্য ভাষায়
কত অজস্র কথা বলা হয়েছে
তাঁকে নিয়ে
কত সভা
কত মিছিল
শাংহাই থেকে শিকাগো
সবই লেনিনের সম্মানে
স্মৃতিতে

নের এক অজ গাঁ
কুজান-বুলাক
সেখানকার কম্বলবোনা তাঁতিরা
কেমন ক'রে সম্মান দেখিয়েছিল

কমরেড লেনিনকে
শুনতে চাও
ছোট্ট সেই গাঁয়ে
বসত করত
জনা বিশেক তাঁতি
কাজ শেষ হলে
সন্ধেবেলায়
ঘরের দাওয়ায় বসে গল্প করতে করতে
হু হু ক'রে
কেঁপে উঠত তারা
জ্বর
ভীষণ জ্বর
একজনের থেকে দুজনে ছড়াত
দুজন থেকে
বিশ জনে
উটের পুরনো দুর্গন্ধ খাটাল থেকে
উঠে আসত
গুনগুন
মশার মেঘ
ছেয়ে ফেলত
কাছের রেল ইস্টিশানকে

ঐ রেলপথেই
দু-হপ্তায় একবার
যে-পথে আসত
জল আর জ্বালানি
একদিন খবর এল
লেনিন স্মৃতি দিবস
এগিয়ে আসছে
কুজান-বুলাকের গরিব তাঁতিরা
ঠিক করল
কমরেড লেনিনের আবক্ষ এক প্রতিমূর্তি
স্থাপনা করবে তারা
তাদেরও গাঁয়ে

যদিও গরিব তবুও
কিন্তু
এই ভাল কাজের জন্য
টাকা তুলতে গিয়ে
তারা দেখল
জ্বরে কাঁপছে তারা সবাই
রক্ত-জল-করে-পাওয়া
কোপেক
গুনতে গিয়ে দেখল
কাঁপছে হাত

রেড আর্মির লোক
স্তেপা গ্যামিলি
অবাক শ্রদ্ধায় দেখছিল
লেনিনকে সম্মান জানাবার
কী তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কাঁপছে
গরিব এই লোকগুলি
খুশি হচ্ছিল সে
কিন্তু
সে ওদের অসুখটাও দেখল
দেখল জ্বরে-কাঁপা ওদের দুর্বল হাত
হঠাৎ
সে আনল এক প্রস্তাব
লেনিনের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য
যোগাড় হয়েছে যে টাকা
তা দিয়ে কেনা হোক
পেট্রোলিয়াম
হ্যাঁ
আর তা ঢেলে দেওয়া হোক
ঐ উট খাটালের নোংরা পাঁকে
যেখানে থেকে আসছে
মশার মেঘ
বিষাক্ত পাখায় জ্বরের কাঁপুনি নিয়ে
এই ভাবে

তারা লড়াই করতে পারবে
জ্বরের সঙ্গে
আর এই ভাবেই
জানানো হবে শ্রেষ্ঠ সম্মান
মহান কমরেড লেনিনকে

কুজান-বুলাকের তাঁতিরা রাজি হল

স্মৃতি দিবসে
পুরনো ভাঙা তাদের বালতিগুলো
ভ'রে ভ'রে
তারা এনে ঢেলে দিল
পেট্রোলিয়াম
একজনের পর আরেকজন
সেই পাঁকের ওপরে

এইভাবে
মারীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে
তারা নিজেদেরকে বাঁচাল
আর সম্মান করল
লেনিনকে
লেনিনকে সম্মান করল
আর খুঁজে নিল
নিজেদের বাঁচার পথ

সেইদিন সন্ধ্যায়
সবটুকু পেট্রোলিয়াম
যখন ঢালা হয়ে গেছে
সব কাজ শেষ
একটি লোক উঠে দাঁড়াল
সব লোকের মাঝ থেকে
সে বলল
গাঁয়ের ইষ্টিশানে
তারা লাগাবে একটি ফলক
তাতে বলা থাকবে

এই ঘটনাটি
কেমন ক'রে
লেনিনের প্রতিমূর্তির বদলে
চ'লে এল
বালতি ভর্তি পেট্রোলিয়াম
আর তাও
লেনিনেরই সম্মানে

তাও করা হ'ল
লাগানো হ'ল
একটি ফলক
কুজান-বুলাকের
গ্রাম্য ছোট্ট ইষ্টিশানে।

অশোক মুখোপাধ্যায়

কুইয়ান-বুলাকের কম্বলতাঁতিরা

কমরেড লেনিন বন্দিত হয়েছেন
বহুবার, সুপ্রচুরভাবে। তাঁর মূর্তি এখানে ওখানে।
শহর এবং শিশুরা নাম পেয়েছে তাঁর।
বহুতর ভাষায় বক্তৃতা হয়েছে,
সভা সমাবেশ, মিছিল রাশি রাশি
শাংহাই থেকে শিকাগো জুড়ে, তাঁর সম্মানে।
কুইয়ান-বুলাকের কম্বলতাঁতিরা
তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল এইভাবে :

বিশজন তাঁতি তারা, সন্ধ্যায়
জীর্ণ টুলের উপরে বসতেই হাড় কাঁপিয়ে তাদের জ্বর এল।
ব্যাধির প্রকোপ বিস্তৃত হয়ে পড়ে ; কাছের ইষ্টিশন
ভ'রে ওঠে ভনভনে মশার ঝাঁকে—
পুরোনো উটের আস্তাবলের পিছনে জলাভূমি থেকে যারা উঠে আসে।

কিন্তু যে-রেলপথ
খাবার জল আর ধুলো-ধোঁয়া এনে দেয় দু-হপ্তা অন্তর,
একদিন এ-খবরও নিয়ে আসে :
লেনিন দিবস বেশি দূরে নয়।
তাই কুইয়ান-বুলাকের লোকেরা ভাবল—
গরিব তাঁতি যদিও তারা—
তাদের তল্লাটেও বসানো হবে প্লাস্টারে গড়া
কমরেড লেনিনের আবক্ষমূর্তি।

কিন্তু সেই মূর্তির জন্য তারা যেই টাকা তুলতে লেগেছে
অমনি সবাই কাহিল হ'ল জ্বরে, তাদের
কষ্টে-পাওয়া পয়সাগুলি গুনে দেখল হিহি-কাঁপা হাতে।
তখন লালফৌজের সৈন্য স্টেপা গামেলেভ—
সেও একমনে গুনছিল আর তীক্ষ্ণ চোখে সব দেখছিল—
খুশি চোখে দেখল লেনিনকে শ্রদ্ধা জানাতে সবাই ব্যগ্র,
অথচ তার চোখে না-প'ড়ে পারল না কম্পিত হাতগুলি।
হঠাৎই যেন সে প্রস্তাব ক'রে বসল
লেনিনের জন্য তোলা ঐ টাকা দিয়ে কেনা হোক পেট্রোল
আর ঢেলে দেওয়া হোক তা আস্তাবলের স্যাঁতসেঁতে পিছনটায়।
এইভাবে একসঙ্গে খতম হবে কুইয়ান-বুলাকের জ্বর, আর হবে নিবেদন
দৃপ্ত শ্রদ্ধা অমর আত্মার প্রতি।

সবাই রাজি হয়ে গেল। তারপর লেনিন দিনে তারা
ভাঙ্গাচোরা বালতিগুলো কালো পেট্রোলে ভ'রে
হাতে হাতে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে
জলাটার উপরে ঢেলে দিল।

এইভাবে লেনিনকে সম্মান জানাতে গিয়ে তারা সাহায্য করল নিজেদের
আর নিজেদের সাহায্য করতে গিয়ে তাঁকে জানালো শ্রদ্ধা, আর
এভাবেই বুঝতে পারল তাঁকে।

সমীর দাশগুপ্ত

[কবিতাটির শেষ অংশ—যেখানে বলা হয়েছে কুইয়ান-বুলাকের তাঁতিরা অতঃপর সামান্য অর্থব্যয়ে স্টেশনে একটি ফলক টাঙ্গিয়ে তার উপর তাদের কৃতকর্মের খবর এবং কিভাবে তারা লেনিনকে সম্মান জানিয়েছিল সেকথা লিখে রাখল—বর্তমান অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।]

দস্তার কফিনে শুয়ে এক বিক্ষোভকারী

এইখানে এই দস্তার কফিনের মধ্যে,
একজন মানুষ শুয়ে আছে, প্রাণহীন।
হয়তো তার আপাদমস্তকই শুধু
তার নিজের চাইতে অনেক কম
হয়তো তার কিছুই নয়, যখন সে ছিল
এক বিক্ষোভকারী।
সমস্ত অঘটনের মূল কারণ হিসেবে সে হয়েছিল চিহ্নিত।
"ওকে নিশ্চিহ্ন করো"। এই ছিল আদেশ।
শবানুগমন করতে পারবে একমাত্র তার স্ত্রী।
"আর যদি কেউ তার সঙ্গ নাও,
সেও হবে চিহ্নিত।"
দস্তার কফিনের মধ্যে যে শুয়ে আছে
অনেক কারণেই সে করেছিলো বিক্ষোভ
তোমার পেটপুরে খাওয়ার জন্য,
তোমার মাথার উপর একটা ছাদের জন্য,
তোমার সন্তানদের আহারের জন্য,
তোমার শেষ কপর্দক বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।
তোমার মতো সমস্ত অত্যাচারিতের
একতার জন্য। আর মানুষের প্রতি মানুষের
ভালোবাসার জন্য।
দস্তার কফিনে শুয়ে-থাকা মানুষটি বলেছিলো,
আর একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দারুণ প্রয়োজন।
আর তোমরা, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ
তোমরাই গ্রহণ করবে নেতৃত্ব।
নইলে আগামী পৃথিবী আজকের চেয়ে বেশি
দিতে পারবে না কিছুই।
দস্তার কফিনে শুয়ে থাকা মানুষটি,
এই বলেছিলো বলেই
আজ তার স্থান হয়েছে দস্তার কফিনে।
তাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে।

বিক্ষোভকারী হিসেবে সে তোমাদের করছিল
উত্তেজিত আর অশান্ত।

'শোনো তোমরা' তোমাদের মধ্যে যে-কেউ
পেট পুরে খাওয়ার কথা বলবে,
চাইবে মাথার ওপর একটা ছাদ,
বলবে তোমার সন্তানদের আহারের কথা,
চাইবে না শেষ কপর্দকশূন্য হতে।
চিন্তা করবে সাধারণ মানুষের জন্য,
ঘোষণা করবে তোমার একতা
সমস্ত অত্যাচারিতের সঙ্গে।
তখনই তুমি আজ থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত, এর মতো
বিক্ষোভকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে,
মৃতদেহ হয়ে পড়ে থাকবে দস্তার কফিনে।
তারপর কবরস্থ হবে।

অনুপম গুপ্ত

বিপ্লবীর অন্ত্যেষ্টি

এখানে এই কফিনে
শুয়ে আছে একজন
নাকি শুধু তার করোটি, ক'খানা হাড়
যৎসামান্যতর তার
নাকি তাও নয়, কিছু নয় ও সবই
ও যে ছিল বিপ্লবী।

তাকে বলা হ'ল যত নষ্টের গোড়া।
তাকে দেয়া হ'ল গোর। বড় জোর
স্ত্রী যেতে পারলো কবরস্থানে
কেননা যে-জন অনুগমনেও যাবে
ঐ একই আখ্যাই পাবে।

কফিনের ঐ-জন
তোমাদের উশকিয়ে
বলেছিল চাই :
পেট-ভরানোর মতন খাদ্য
মাথা গোঁজবার ঠাঁই

প্রতিটি শিশুর নির্বাধ হোক পুষ্টি
আর হাতে চাই সচ্ছল স্বাচ্ছন্দ্য
আর সংহতি—তোমাদের মতো সকল শোষিতে শোষিতে
আর পেতে চাই চিন্তার স্বাধীনতা।

আরও বলেছিল কফিনের ঐ-জন
উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে তোমাদের মজবুরি
এবং তোমরা কোটি অর্বুদ মেহনতি মজদুরই
তোমরাই নেবে নেতৃত্বের ভার
সামনের দিন বড় দুঃসহ ধৈর্যও ধরবার।

কফিনের জন যেহেতু এমনি এই কথা বলেছিল
কফিনেই তার গতি হ'ল আর গোরে কোন মতে মাটি
তোমাদের ও যে বলেছিল এই সবই
ও যে ছিল বিপ্লবী

তাই যে বলবে পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া
আর যে বলবে বাস্তুবসতভিটে
আর যে বলবে দিন-গুজরানো কড়ি
আর যে বলবে শিশুর আহার পুষ্টি
আর যে বলবে চিন্তার স্বাধীনতা
আর অভিন্নস্বার্থ শোষিতে-শোষিতে
তাকে যেতে হবে—ও যে বিপ্লবী—যেতে হবে চিরকাল
অমনি একটি নগন্যতম কফিনে
এবং কবরে যেনতেন কিছু মাটি।

নীহাররঞ্জন বাগ

বুদ্ধ যে-কাহিনী শোনালেন

লোভের চাকাতে যে আমরা বাঁধা
—এ কথা গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন,
এবং উপদেশ দিয়েছিলেন যেন
আমরা সব লোভ ত্যাগ করি
এবং এইভাবে নির্বাণ লাভ করি।

একদিন তাঁর শিষ্যরা প্রশ্ন করল :
এ-নির্বাণ কীরকম, প্রভু?
আপনার কথামতো আমরা
প্রত্যেকে লোভ ত্যাগ করব, কিন্তু
আমাদের বলুন,
যে-নির্বাণ আমরা তখন লাভ করব,
তা কি
সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া?
যেমন, আপনি জলের ওপরে শুয়ে থাকেন
দুপুরবেলায়, ভারহীন, চিন্তাহীন
জলের ওপরে অলস ভাবে শুয়ে থাকেন,
অথবা আধজাগা অবস্থায়
অজান্তে কখন দ্রুত ডুবে-যাওয়া কম্বলটাকে
সোজা ক'রে নেন—
এ-নির্বাণ কি তবে
সে-রকম সুখের, রমণীয় কিছু?
অথবা আপনার এই শূন্যময়তা
শুধুই কিছু-না-হয়ে থাকা, শীতল, জড়, শূন্যতা?

বুদ্ধদেব বহুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর
উদাসীন ভাবে বললেন :
'তোমাদের প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।'
তারপর সন্ধেবেলায় তারা সব চ'লে গেলে
তিনি তখনো পিপুলগাছের নিচে ব'সে
প্রশ্নহীন কয়েকজনকে
এই গল্পটি বললেন :

সেদিন একটি বাড়ি দেখতে পেলাম।
আগুন ধ'রে গেছে। আগুনের শিখা
বাড়িটির ছাদ লেহন করছে। কাছে গেলাম।
দেখলাম ভিতরে তখনো লোক।
আমি ভিতরে ঢুকে তাদের বললাম
বাড়িতে আগুন ধ'রে গেছে এবং
তারা যেন তখনই বেরিয়ে আসে।
কিন্তু সেই লোকগুলি কোনো তাড়া দেখাল না।
তাদের মধ্যে একজন—
আগুনের হল্কা যার ভ্রূ-দুটিকেও ছুঁয়েছে—
আমাকে জিজ্ঞেস করল
বাইরের অবস্থা কীরকম, বৃষ্টি কি পড়ছে না?
বাতাস কি বইছে না?
তাদের জন্যে কি অন্য একটি বাড়ি আছে?
এবং এ-ধরণের আরও নানা প্রশ্ন।
কোনো উত্তর না দিয়ে আমি আবার বেরিয়ে গেলাম।
মনে হ'ল,
ঐ লোকগুলির—প্রশ্ন-করা না থামালে—
পুড়ে মরাই উচিত।
এবং সত্যিই বন্ধুগণ, যে-লোক ঘরের মেঝেতে
এখনো এ-রকম তাপ অনুভব করছে না
যে ঘরে থাকার পরিবর্তে সানন্দেই
সে অন্য যে-কোনো অবস্থার মধ্যে যেতে প্রস্তুত—
তাকে আমার কিছুই বলার নেই।

গৌতম বুদ্ধ তাই বললেন।
কিন্তু আমরাও,
যারা আর মেনে-নেবার অভ্যাসে অনীহ,
বরং বলা যেতে পারে
মেনে-না-নেয়াটাই চাই,
এবং পার্থিব বহুরকমের প্রস্তাব দিয়ে
মানুষকে তার যন্ত্রণাকারীদের
খতম ক'রে দিতে বলছি,
আমরাও, বিশ্বাস করি যে

যারা শাসকশ্রেণীর বোমারুবিমানের
সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় প্রশ্ন করে :
আমরা এ-কাজ কীভাবে করবার কথা ভাবতে পারি
অথবা ও-কাজ কী ক'রে করব—
এবং বিপ্লবের পর
তাদের জমানো টাকা
আর ছুটির কাপড় জামার কী দশা হবে,
তাদের প্রতিও
আমাদেব কিছু বলার নেই।

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

শেক্সপিয়রের হ্যামলেট প্রসঙ্গে

(সনেট)

এই যে দেহটা, স্ফীত প্রাণহীন,
এখনো খুঁজে পাবে চিন্তার জীবাণু।
ইস্পাতে সজ্জিত জগতে অসহায় অক্ষম,
ঢিলে কামিজ পরা এই আত্মগত মাতাল।

দামামা বাজিয়ে আবার জাগাবে ওকে
ফর্টিনব্রাস আর তার নির্বোধের দল
এক টুকরো জমি দখল অভিযানে
মৃত সৈনিকের সমাধির চেয়ে ছোট।

তাই তো ওর মাংসপেশী কম্পিত ক্রোধে,
মনে হয় ও করেছে অনেক কালক্ষেপ,
সময় এসেছে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটাবার।

সুতরাং শেষ অঙ্কের শেষে আমরা গদগদ,
ওরা বলে, হ্যাঁ, এ রাজার মত রাজা হ'ত,
যদি বসতে পেত সিংহাসনে।

উৎপল দত্ত

ছাত্র বিনা শিক্ষাদান বিষয়ে

ছাত্র বিনা শিক্ষা দেওয়া
নামডাক বিনা লিখে যাওয়া
সে বড়ো কঠিন কাজ।

বেশ হয় যদি সকালে বেরিয়ে পড়া যায়
তোমার নতুন লেখা পাতা কটি নিয়ে
অপেক্ষমান মুদ্রাকরের কাছে, পার হ'য়ে গুঞ্জরিত বাজার
যেখানে বিক্রি করে মাছমাংস আর মজুরদের যন্ত্রপাতি :
তোমার বিক্রির জিনিশ হ'ল বাক্য।

চালকটি জোরসে হাঁকিয়ে গেছে,
সকালে তার আর খাওয়া হয়নি
প্রত্যেকটি বাঁকে ছিল বিপদের আশঙ্কা
ত্বরিতে ফটক পার হ'য়ে ও
যাকে তুলে নিতে এসেছিল
সে আগেই বেরিয়ে পড়েছে।

ঐ তো লোকটি কথা ব'লে যাচ্ছে যার কথা কেউ শোনে না :
ও বড়ো চড়া গলায় কথা বলে
আর পুনরাবৃত্তি করে একই কথার।
ও যা বলে তা ভুল :
কিন্তু কেউ ওকে শুধরেও দেয় না।

বিষ্ণু দে

শ্রমিক অভিনেতাদের উদ্দেশে

এই যে এসেছ তোমরা মঞ্চে দাঁড়াবে বলে, তোমরা আগে
বলো আমাদের : লাভটা ঠিক কী?
মানুষের সামনে নিজেকে দেখাতে চাও

দেখাতে চাও কী করতে পারো তোমরা, তুলে ধরতে চাও
যা কিছু দেখার যোগ্য...
আর ভাবো যে লোকেরা
বাহবায় ভরে দেবে তোমাদের কেননা তাদের
ভাসিয়ে নিয়েছ খুদে তাদের জগৎ থেকে বিশাল ভুবনে, যেন তৃপ্তিভরে
পাহাড়চুড়োয় এসে ঝিমঝিম করে ওঠে মাথা, আবেগ ভরাট হয়ে ওঠে।
আর এইবার তোমাদের কাছে জানতে চাই : লাভটা ঠিক কী?

কেননা এখানে, নীচে এই আসনগুলিতে
তোমাদের দর্শকেরা মেতে গেছে তর্কে, বলে উঠছে কোনো কোনো গোঁয়ার :
কখনোই ঠিক নয় তোমাদের নিজেকেই দেখানো কেবল, দেখাবার কথা ছিল
সমস্ত পৃথিবী। বলে তারা : আরো একবার কী লাভ এসব দেখে
এই লোক কেমন কাতর হতে পারে, এ মেয়েটা হতে পারে কত-বা হৃদয়হীন
কিংবা পেছনের ও-লোকটি শয়তান রাজার মতো হতে পারে কেমন সহজে।
ভাগ্যের নির্মম চাপে অল্প কিছু মানুষের
কিছু ভঙ্গি কিছু মুদ্রা নিয়ে নিরন্তর এই প্রদর্শনায় লাভটা ঠিক কী?

যা তোমরা দেখিয়ে যাও সে শুধু ভাগ্যের বলি। বাইরের ক্ষমতার হাতে
আর ভিতরের প্রবৃত্তির হাতে অসহায় বন্দীদের মূর্তিই দেখাও শুধু।
কুকুরের মতো তারা লুফে নেয় সুখ
যেন কোনো অদৃশ্যের হাত থেকে ছুঁড়ে দেওয়া আশাতীত টুকরো এক রুটি, আর
করুণাও ঝরে পড়ে উঁচু থেকে, ঠিক যেন গলার উপরে এসে ঝুলে পড়ে
আচমকা ফাঁস।

কিন্তু আমরা, নিচের আসন থেকে এই দর্শকেরা
তোমাদের নানা ভঙ্গি আর হাত-পা নাড়ায় চমৎকৃত
ঝকঝকে ঘূর্ণমান চোখ মেলে দেখি
তোমাদের হাতফেরতা স্বেচ্ছাপ্রদ সুখ আর
অদম্য করুণা।

না—নীচের এ সারি থেকে অতৃপ্তিতে আমরা চেঁচিয়ে উঠি—
ঢের হলো। ওসব চলবে না আর। এখনো কি শোনোনি যে
সকলেই জানে আজ মানুষই বুনেছে আর মানুষই ছুঁড়েছে এই জাল?
সব দিকে, সাগরের উপকূলে একশো তলার কোনো শহরের ধার থেকে
আড়াআড়ি ভেসে যাওয়া জাহাজের টানে

নিভৃত পল্লীরও দিকে কথাটা ছড়িয়ে গেছে আজ :
মানুষের নিয়তি মানুষ। তাই
তোমাদের বলি আমরা, আমাদের একালের অভিনেতা তোমরা, বলি
সবকিছু ছুঁড়ে ফেলবার এই কালে, প্রকৃতির ওপর
এমন-কি মানবপ্রকৃতির ওপর অসীম এ প্রভুত্বের কালে
আমরা বলি নিজেদের পালটে নাও তোমরা, আর মানুষের পৃথিবী যেমন
যেভাবে গড়েছে তাকে লোকে আর পাল্টাতেও পারে তাকে যেরকম ভাবে
তেমনি দেখাও তাকে।

মোটের ওপর এই হলো দর্শকের কথা। অবশ্য সকলে ঠিক
এইভাবে বলে যে তা নয়। ঝুলেপড়া কাঁধে
কুঁজো হয়ে বসে থাকে কেউ, তাদের কপালে বলিরেখা
যেমন পাথুরে জমি বারবার হল দিয়ে টেনে লাভ হয় না কোনো।
প্রতিদিন অফুরান প্রতিঘাতে দুমড়ে গিয়ে তারা আজ লুব্ধ হয়ে চাইছে সেসব
অন্যদের কাছে যা ঘৃণার। ঝিমধরা চেতনাকে
একটু চনমনে করে তোলা। অল্পকিছু শক্ত করে নেওয়া
শিথিল ধমনী। সহজ রোমাঞ্চ। যে-পৃথিবী জয় করতে পারবে না তারা
তার থেকে তুলে নিয়ে যাবে যেন কোনো জাদুহাত। অভিনেতা, এর
কোন দর্শককে চাও তুমি? আমি বলি : ওই
অতৃপ্তদের।

কিন্তু কীভাবে ঘটবে সেটা? মানুষের এই
দল বেঁধে বেঁচে থাকা ছবি কীভাবে আঁকবে যাতে আরও বোঝা যায়
আরও বেশি অধিকার করা যায় তাকে? কীভাবে
নিজেকেই না দেখিয়ে
কিংবা জালেবাঁধা অন্যদেরই হাবভাব না দেখিয়ে শুধু
পারা যায়? কীভাবে দেখানো যায় আজ
নিয়তির জাল বোনা, জাল ছুঁড়ে দেওয়া?
আসলে যা মানুষেরই বোনা মানুষেরই হাতে ছুঁড়ে দেওয়া? প্রথমেই
তোমাকে জানতে হবে দেখার শিল্পকে।

তুমি, অভিনেতা
অন্য সব শিল্প ছেড়ে আগে তোমাকে আয়ত্তে পেতে হবে
দেখার শিল্পকে।

কেননা, দেখতে কেমন তুমি, সেটা নয়
জরুরি কেবল আজ কী তুমি দেখেছ আর কী তুমি দেখাতে পারো ঠিক।
যা তুমি যথার্থ জানো সেটাই জানার যোগ্য শুধু।
লোকে লক্ষ করে দেখতে চায়
তুমি ঠিক দেখেছ কতটা।
যে শুধু নিজেকে দেখে সে কখনো মানুষ জানেনি।
নিজেকে নিজের থেকে লুকোবার ব্যাকুলতা তার। আর
সে যতটা, অন্য কেউ ততখানি সুচতুর নয়।

তাই, তোমার শেখার শুরু হোক
বেঁচে থাকা মানুষের কাছে। তোমার প্রথম স্কুল হোক
তোমারই কাজের জায়গা, বাসস্থান, শহরের যে অঞ্চলে থাকো তুমি,
পথঘাট, দোকানপসার। দেখো সব লোকজন
লক্ষ করে দেখো, পরিচিতদের দেখো অপরিচয়ের চোখ দিয়ে
অজানাকে জেনে নাও যেন তারা খুবই জানা লোক।

ওই যে একজন তার ট্যাক্স দিচ্ছে, দেখো। যারা ট্যাক্স দেয়
তাদের সবারই মতো নয় ও, যদিও সবাই
ও-রকমই অনিচ্ছায় দেয়। বাস্তবিকই,
এ কাজে দাঁড়িয়ে থেকে ও ঠিক নিজেরও মতো নয় সব সময়
আর ওই একজন নিচ্ছে সেই ট্যাক্স।
যে দেয় তার চেয়ে ও কি খুবই ভিন্নতর কেউ ভাবো?
সেও যে কখনো ট্যাক্স দেয় তাই শুধু নয়, আরও কোনো কোনো
মিল পেতে পারো এ দুজনে। আর ওই মহিলাটি
সমস্ত সময়ে অত রূঢ়ভাষী নন, আবার উনিও
সকলেরই কাছে অত মায়াময়ী হয়ে নেই সমস্ত সময়ে। আর ওই যে
দাপুটে অতিথি, ওর কি দাপটই শুধু আছে? বুকে ভয়ও নেই?
আর ওই নির্জীব মহিলা, বাচ্চাটার জুতো নেই যার
ওরই কি শক্তির স্তম্ভ দিয়ে জেতা যায়নি সাম্রাজ্য বিশাল?
ওই দেখো, আবার সে গর্ভবতী। আর, কখনো কি দেখেছিলে তুমি
সুস্থতা কখনো আর ফিরবে না জানবার পর রুগণ মানুষের মুখচ্ছবি?
অথচ যে জানে সেও ভালো হতে পারত যদি কাজ করতে না হতো? দেখো ওকে
জীবনের বাকি দিনগুলি শুধু উলটে যায় বই
যে এই শেখায় ওকে কীভাবে বানানো যায় পৃথিবীকে বাসযোগ্য গ্রহ।

ভুলো না পর্দারও ছবি, কিংবা কাগজেরও ছবিগুলি। দেখো
কীভাবে ওদের কথা বলা, হাঁটা, ওই যারা
পাশবিক শাদা হাতে ধরে আছে তোমাদের নিয়তির সুতো।
ঠিকভাবে লক্ষ করে যেতে হবে এই সবই। কল্পনায় দেখো
যা-কিছু তোমার চারদিকে ঘটছে, সমস্ত সংঘাত
ঠিক যেন ইতিহাসে ঘটে যাচ্ছে বলে। তাকে দেখে যাও, কেননা সেইভাবে
তোমাকে দেখাতে হবে মঞ্চে এই সব।
চাকরি পাবার যুদ্ধ, ওই লোক আর তার প্রিয়ার মধুর বা তিক্ত আলাপন,
বই নিয়ে তর্ক, নিরাশ্বাস অথবা বিদ্রোহ, চেষ্টা আর নিষ্ফলতা
এই সবই তোমাকে দেখাতে হবে যেন ইতিহাসে ঘটেছিল সব
(এমনকি যা এখানে ঘটে যাচ্ছে এ মুহূর্তে, সে ছবিটা
ভাবতে পারো এইভাবে, একজন
বাস্তুহারা নাট্যকার তোমাদের কাছে এসে
শেখাচ্ছে দেখার শিল্প।)

দেখার জন্য
শিখতে হয় তুলনা। তুলনার জন্য
জানতে হয় দেখা। দেখার মধ্য দিয়ে
জেগে ওঠে জ্ঞান; আবার, দেখার জন্যও
চাই জ্ঞান। আর
অসম্পূর্ণ তার দেখা যে জানে না কীভাবে
দেখাকে প্রয়োগ করা যাবে। পথচলতি মানুষের চেয়ে
তীক্ষ্ণতর চোখ নিয়ে আপেলগাছের দিকে তাকায় যে বানিয়েছে ফল
কিন্তু কেউই মানুষকে জানে না ঠিকমতো যতক্ষণ সে না জানে
মানুষের নিয়তি মানুষ।

মানুষের ব্যবহারে লাগা
দেখার এ শিল্প হলো মানুষের সঙ্গে ব্যবহার-শিল্পের
এক শাখা। অভিনেতা, তোমাদের কাজ হলো এই
মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের আচারের পথ খুঁজে দেওয়া, শেখানো সে পথ।
তাদের প্রকৃতি জেনে, তাদের সামনে তা দেখিয়ে, তাদের
শেখাও কীভাবে তারা নিজেদের সঙ্গে করবে ব্যবহার। শেখাও তাদের
দল বেঁধে বাঁচার মহৎ শিল্প।

হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি তোমরা বলছ :
আমরা বিব্রত নির্যাতিত, পরাধীন শোষিত আমরা যারা
অজ্ঞানের অন্ধকারে বেঁচে আছি নিরাপত্তাহীন
আমরা কী করে পাব ওদের উজ্জ্বল দৃষ্টিকোণ, ওই যারা পথিকৃৎ আবিষ্কারক
কুক্ষিগত করে নিতে চায় বলে অন্য দেশ যারা ভরে দেয়
সামরিক প্রদক্ষিণে? আমরা তো শুধু
আমাদের চেয়ে বহু ভাগ্যবানদের হাতের পুতুল হয়ে বেঁচে আছি।
ফল ফলাবার গাছ থেকে কীভাবে-বা আমরা হঠাৎ
মালী হয়ে যেতে পারি আজ?
ঠিক তাই
ঠিক সেই শিল্প আজ শিখে নিতে হবে তোমাদের, তোমরা যারা
অভিনেতা, কর্মী একাধারে।
কাজে যদি লাগে তবে কোনোটাই শিখে নেওয়া
অসম্ভব নয়। প্রতিদিনকার কাজে যা তুমি দেখতে পাও
তার চেয়ে বড়ো কোনো দেখার ক্ষমতা নেই কারো।
চিনে নাও ওস্তাদের দক্ষতা ও দুর্বলতা, মেপে নাও
সহকারীদের যত ভাবনা ও অভ্যাস—
কাজে লেগে যাবে। মানুষের কথা ছাড়া
কীভাবে ঘটানো যাবে শ্রেণীসংগ্রাম? তোমাদেরই মধ্যে দেখি
সবচেয়ে দড় যারা, তারাই ঝাঁপিয়ে পড়ে নবচেতনার দিকে
যে-জ্ঞান দেখার শক্তি বাড়িয়ে তুলেছে তার দিকে
নতুন জ্ঞানের দিকে। এরই মধ্যে তোমরা অনেকেই
দলবাঁধা মানুষের রীতিনীতি বুঝে নিতে চাও, এরই মধ্যে
তোমাদের শ্রেণী তার সমস্যার নিরসনে বদ্ধপরিকর,
আর সে তো নিরসন
সব মানুষেরই। শুধু এভাবেই—শিখে ও শিখিয়ে দিয়ে সব—
শ্রমিকের অভিনেতা
তোমাদের একালের মানুষের সমস্ত সংগ্রামে আজ
নিতে পারো দায়, শুধু এভাবেই
তোমার নিষ্ঠায় আর জ্ঞানের আনন্দ নিয়ে তুমি
সকলের মধ্যে আজ জাগিয়ে তুলতে পারো সংগ্রামের বোধ আর
ন্যায়ের আবেগ।

শঙ্খ ঘোষ

দিনেমার শ্রমিকশ্রেণীর অভিনেতাদের প্রতি সম্ভাষণ

তোমরা এখানে এসেছ থিয়েটারে কাজ নিয়ে, কিন্তু আগে
বলো অর্থ কী তার?
তোমরা সাধারণ্যে নিজেদের দেখাতে এসেছ
কী এমন করতে পার যাতে হয়ে ওঠো
দেখার যোগ্য কিছু...
তোমরা তো আশা কর সাধারণ মানুষ
তোমাদের হাততালি দেবে যখন তাদের তোমরা উড়িয়ে নিয়ে যাবে
তাদের পৃথিবী থেকে তোমাদের বিস্তৃততর পৃথিবীতে
উপভোগ করার সুযোগ দেবে খাড়াই চূড়ায় ওঠার মাথা-ঘোরা,
উত্তুঙ্গ আবেগ। তোমাদের জিগেস করি : অর্থ কী তার?
কারণ, নিচে কমদামি সীটে
দর্শকরা ঝামেলা শুরু করেছে : কেউ কেউ
উদ্ধতভাবে জিদ ধরছে যে, তোমরা কিছুতেই
কেবলই নিজেদের দেখাতে পারবে না, দেখাতে হবে
এই জগৎ সংসার। তারা বলছে লাভ কী আমাদের
এইসব আরেকবার দেখতে পেয়ে—এ লোকটা
কেমন কাঁদতে পারে, ও মহিলা কেমন হৃদয়হীনা হন,
কিংবা পিছনের ও লোকটা শয়তান-রাজার
চরিত্রচিত্রণে কত দক্ষ।
ভাগ্যের বজ্রমুঠোয় কতিপয় মনুষ্যের
গতিবিধি প্রকাশভঙ্গিমা বারবার দেখাবার প্রয়োজন কোথায়?
আমাদের সামনে তোমরা যা আনো সে সবই শিকার, অভিনয় করো
যেন ভেতরের আবেগ ও বাইরের শক্তির হাতে অসহায় শিকার তোমরা
ওদের আনন্দ ওরা গ্রহণ করে কুকুরের মত, অদেখা হাত থেকে
দোলানো, অপ্রত্যাশিত শক্ত রুটি যেন, এবং গলার ফাঁস
যেমন উঁচু থেকে অপ্রত্যাশিত প'ড়ে গলা বাঁধে, তেমনি ভাবেই
উঁচু থেকে ফেলা দুঃখ কিছু। কিন্তু নিচুতলার দর্শক আমরা,
আমাদের স্বচ্ছ চোখ রঙিন চশমা তোমাদের দক্ষতায়,
তোমাদের মুখভঙ্গি তোমাদের শরীর দোমড়ানোর দিকে স্থির
রেখে ব'সে অনুভব করছি হাত-বদলে-আসা দান-করা আনন্দ
আর অবশ দুঃখ কিছু।

না, আমরা আক্ষেপে চেঁচাচ্ছি নিচুতলার আসন থেকে
যথেষ্ট হয়েছে। ওতে আর চলবে না। তোমরা কি সত্যই
শোনোনি এখনও সেই জনশ্রুতি, যাতে বলে
এ জাল মানুষই বুনেছে আর চাপিয়েছে মানুষ নিজেই?

আজ তো সর্বত্র, সাততলা বাড়ি থেকে
পরিপূর্ণ জলযানে নিয়মিত চষা সমুদ্র ছাড়িয়ে
নির্জনতম গ্রামে রটে গেছে
মানুষের নিয়তি শুধুই মানুষ।

—সুতরাং

তোমরা যারা আমাদের এই পরিবর্তনশীল স্বভাবের ওপর,
এমন কি মানুষের নিজের স্বভাবের ওপর, সীমাহীন দক্ষতার যুগের
অভিনেতা, তোমাদের কাছে দাবি : নিজেদের বদলাও
আর দেখাও আমাদের মানুষের পৃথিবীটা আসলে যেমন :
মানুষের তৈরি আর মানুষেরই হাতে তার উন্নতির সব সম্ভাবনা।

আশিস মজুমদার

অজেয় লিপি

প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলোয়
সান কার্লোতে ইতালীর জেলের এক খুপরিতে
কিছু সৈন্য মাতাল আর চোর যেখানে বন্দী
সেখানে সোশ্যালিস্ট এক সৈনিক কপিং পেন্সিলে একদিন আঁচড় কাটল দেয়ালে
'দীর্ঘজীবী হোন লেনিন!'

ধূসর খুপরিতে, আবছা কিন্তু বিশাল হরফে
কথাগুলি লেখা
জেলারমশাই দেখলেন, দেখে এক বালতি চুনসুদ্ধ
পাঠালেন এক মিস্তিরি
ছোটো একটা বুরুশে সে চুনকাম করে দিল ওই ভয়ংকর লিপি
কিন্তু সে তো কেবল অক্ষরগুলির ওপরেই বুলিয়েছিল চুন

তাই এখন খুপরির ওপরদিকে চুনেই জ্বলজ্বল করছে :
হোন লেনিন!'

তারপর এল আরেকজন বড়োসড়ো এক বুরুশ নিয়ে
গোটা দেয়ালে বুলিয়ে দিল চুন
ফলে বেশ খানিকক্ষণ দেখা গেল না কিছু, কিন্তু সকালবেলা
চুন শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুটে উঠল সেই লিপি, আবার
হোন লেনিন!'

জেলারমশাই এবার এক খোদাইকর পাঠালেন
হাতে তার ছুরি
ছুরি দিয়ে সে কেটে-কেটে তুলে ফেলল একের পর এক অক্ষর
ঘণ্টাটেক জুড়ে
কাজ যখন ফুরোল, খুপরির মধ্যে রইল কেবল
বর্ণহীন
কিন্তু দেয়ালে গভীর করে কুঁদে তোলা অজেয় সেই লিপি :
হোন লেনিন!'

সৈনিকটি বলে ওঠে : এবার তবে দেয়ালটাকেই ভাঙো!

শঙ্খ ঘোষ

উড়িয়ে দাও গোটা দেয়ালটাই

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়
সান্ কার্লোতে, ইতালির এক জেলের খুপরিতে—
যেখানে বন্দি সব জওয়ান, মাতাল আর চোরদের রাখা
হ'ত একসঙ্গে—
কবে এক সমাজবাদী জওয়ান একটা কপিং-পেন্সিল দিয়ে
দেয়ালে আঁচড় কেটে লিখেছিল
লেনিন দীর্ঘজীবী হ'ন।

ওপরে সেই ঘুপ্‌সি খুপ্‌রির মধ্যে দেখা যায় কি যায় না,
কিন্তু বিরাট বিরাট অক্ষরে সেই লেখা।
জেলসাহেবরা যখন তা দেখল, ওরা পাঠিয়ে দিল
এক রঙ-মিস্তিরি
এক বালতি চুন এনে
ছোট একটা কুচি দিয়ে চুনকাম ক'রে দিল সেই
ভয়-দেখানো লেখা।

কিন্তু ও তো চুনকাম করেছিল শুধু অক্ষরগুলো
তাই খুপরির মাথায় এখন দাঁড়িয়ে রইল চুন দিয়ে লেখা
লেনিন দীর্ঘজীবী হ'ন।
তখন এল আরেকজন রঙ-মিস্তিরি—মোটা বুরুশ দিয়ে
গোটা দেয়ালটা দিল রঙ ক'রে
এমন ভাবে যে অনেক ঘণ্টা ধ'রে আর
লেখা দেখাই গেল না—
কিন্তু সকালবেলা
চুন যখন শুকিয়ে গেল, বেরিয়ে এল আবার
লেনিন দীর্ঘজীবী হ'ন।

তখন জেলসাহেবরা পাঠাল এক খোদাইকারকে
ছুরি দিয়ে তুলে ফেলবে লেখা!
অক্ষরের পর অক্ষর সে চেঁছে তুলল
এক ঘণ্টা ব'সে।
যখন তার কাজ শেষ হ'ল, খুপরির ওপর থেকে চেয়ে রইল
রঙ-ছুট
কিন্তু গভীর হয়ে কুঁদে-ওঠা—সেই দুর্জয় লেখা
লেনিন দীর্ঘজীবী হ'ন।

এখন তবে উড়িয়ে দাও গোটা দেয়ালটা : জওয়ানটি ব'লে উঠল।

শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়

দেশের মাথায় আছেন যাঁরা ভাবেন

খাদ্য নিয়ে কথাবার্তা—ছিঃ।
আসল কথা: ইতিমধ্যে তাঁরা
খেয়েদেয়ে ঢেঁকুর তুলেছেন।

যাহোক একটু ভাল মাংস
জিভে একবার ঠেকাবে তার আগেই
নিচের তলার মানুষগুলোর বিদেয় নিতে হবে।

কোত্থেকে যে এরা আসে, যাচ্ছেইবা কোথায়
অবাক হয়ে ভাবার আগে যেই না সন্ধ্যা এল
দ্যাখে, ওরা শ্রান্তিতে সব ধুঁকছে।

আজ অবধি দেখল না কেউ
উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো, বিশাল সমুদ্র
ইতিমধ্যে বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এল।

নীচু তলার মানুষগুলো যদি
নুয়ে থাকার অর্থটা না বোঝে
মাথা তুলে কক্ষণো জাগবে না।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

শ্রমিকরা চেঁচাচ্ছে—রুটি চাই, রুটি

ব্যবসায়ীরা চেঁচাচ্ছে—বাজার চাই, বাজার
বেকাররা তো ক্ষুধার্তই ছিল, এখন
চাকুরেরাও খিদেয় জ্বলছে।
যে হাতগুলো কোলের কাছে গোটানো ছিল
আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—
তারা গোলা তৈরী করছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

দেশের মাথায় আছেন যাঁরা বলেন

শান্তি এবং যুদ্ধ
দুই জাতের দুই বস্তু
কিন্তু তাদের গড়া শান্তি এবং তাদের গড়া যুদ্ধ
হাওয়া এবং ঝড়ের মতো
বড়ই অন্তরঙ্গ।

ওদের শান্তি থেকেই জন্ম নেয় যুদ্ধ
যেমন মায়ের গর্ভ থেকে ছেলে
ছেলের আদল
ভয়ঙ্করী মায়ের মূর্তি যেমন।

ওদের শান্তি ছিটে ফোঁটা
যেটুক ফেলে রাখে
ওদের যুদ্ধ ধ্বংস করে তাও।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

যে যুদ্ধটা আসছে

সেটাই প্রথম যুদ্ধ নয়। এর আগে
আরো অনেক যুদ্ধই হয়েছিল।
শেষতম যুদ্ধটা শেষ হতেই
একদিকে পরাভূত অন্যদিকে জয়যুক্ত।
পরাভূত দলের সাধারণ মানুষ
উপোস থেকেছে। জয়যুক্ত দলের
সাধারণ মানুষও উপোসেই থেকেছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

দেশের মাথায় আছেন যাঁরা বলেন

সৈন্য দলে সবাই হচ্ছে ভাই-ভাই।
আসল সত্য ধরা পড়বে
রান্নাঘরে ঢুকলে।
সবার বুকেই সমান সাহস থাকার কথা
তবে কেন খাবার থালায়
আহার থাকে দুই রকম ?

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

নেতারা যখন

নেতারা যখন শান্তির কথা বলেন
সাধারণ লোকে বোঝে
আসছে লড়াই।

নেতারা যখন লড়াইকে নিয়ে শাপশাপান্ত করেন
জারি হয়ে গেছে কুচকাওয়াজের হুকুম ততক্ষণে।

শঙ্খ ঘোষ

নেতারা যখন শান্তির কথা বলে

সাধারণ লোক—জনসাধারণ জানে
একটা ভীষণ লড়াই ঘনিয়ে আসছে!

যখন নেতারা যুদ্ধকে দেয় গালি
(সাধারণ লোক অভিজ্ঞতায় জানে)
ভাড়াটে গুণ্ডা খুনীদেরই ডাকা হচ্ছে

সাগর চক্রবর্তী

নেতারা যখন শান্তির কথা বলেন

ইতরজনেরা জানে
যুদ্ধ আসছে এগিয়ে।
নেতারা যখন যুদ্ধকে অভিসম্পাত দিতে শুরু করেন,
ততক্ষণে সৈন্য মোতায়েনের আদেশ জারি হয়ে গেছে।

অনুপম গুপ্ত

মোটা আর রোগা

দুটো ছিল ডাকাত তারা লুটছিল দেশ যত
ভাঙছিল সব গরিব চাষীর ঘাড়
একটা ছিল রোগা যেন না-খাওয়া নেকড়ে
অন্যটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ঠিক পোপের মত

একটা কেন রোগা অত অন্যটা হোঁৎকা
একটা ছিল চাকর আর অন্যটা যে প্রভু
মনিব খেত দুধের সর তাইতে নধরকান্তি
চাকর খেত জোলো দুধ আর মনিবের কোঁৎকা

ধরল একদিন দুই ডাকুকে গাঁয়ের চাষী যত
এক দড়িতেই ঝুলিয়ে দিল মোটা এবং রোগা
একটা ঝুলছে হাড়-জিরজির উপোসী নেকড়ে
অন্যটা বেশ নাদুসনুদুস ঠিক পোপের মত

এক দড়িতে ঝুলছে যেন বাঘ আর তার ফেউ
চাষীরা সব অবাক হয়ে দেখে এবং ভাবে
মোটা লোকটা ডাকাত এতো পষ্ট বোঝা যায়
রোগা লোকটা সঙ্গে কেন বোঝে না তা কেউ

অরুণ মুখোপাধ্যায়

মোটরগাড়ি এবং গলার আওয়াজ

শহর থেকে দূরে
কোন বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায়
চমৎকার একটি মোটরগাড়িতে যেতে যেতে
সন্ধের মুখে রাস্তার ধারে
একটি লোক—
ময়লা জামা-কাপড়—
মাথা ঝুঁকিয়ে গাড়িতে লিফ্‌ট চাইল।
আমাদের মাথার ওপর ছাদ ছিল—
আমাদের ঘিরে ছিল একটা চলমান ঘর—
তবু আমরা থামলাম না।
আমরা শুনতে পেলাম
আমারই গলা—ঘড়ঘড়ে, রুক্ষ—বলছে,
'হবে না। কাউকে নিতে পারব না।'
তারপর
অনেক দূর চলে গেছি।—
প্রায় একদিনের পথ—
হঠাৎ আমার সেই গলার শব্দর কথা মনে পড়ে গেল।
ভয়ংকর কষ্ট হোল আমার।
নিজের ব্যবহারের কথা মনে পড়ে
খুব লজ্জা হোল।
তার থেকেও লজ্জা পেলাম
আমাদের এই গোটা পৃথিবীটার জন্য—
যে-পৃথিবী মোটরগাড়িতে চড়ার শর্ত হিসেবে
পালটিয়ে দেয় আমাদের গলার আওয়াজ

অরুণ মুখোপাধ্যায়

সমাধিলেখ ১৯১৯

রাঙা সেই রোজা* মিলিয়ে গেল তো সে-ও।
সে কোথায় শুয়ে জানে না জানে না কেউ,
গরিবদের সে সত্যি কথাটা বলে দিয়েছিল বলে
এ দুনিয়া থেকে খেদিয়ে দিয়েছে তাকে বড়লোকগুলো

* রোজা লুক্সেমবুর্গ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এম-এর জন্য এপিটাফ্

হাঙরদের চোখে ধুলো দিয়ে সট্‌কেছি,
নেকড়েদেরও অনেক করেছি খতম।
যারা আমাকে খেয়েছে
তারা সব ছারপোকা

সমীর দাশগুপ্ত

এপিটাফ

স্মৃতির মিনার কিংবা সমাধি-ফলক
কোনো নেই প্রয়োজন
তবু যদি মন
কিছু চায়, হয়তো বাসনা
তবে শিলাপটে যেন লেখা থাকে :

প্রস্তাব ছিল তার, আমরা
করেছি অনুধাবন।

শুধুই ফলকে লেখা কথা, তবু
এরই মধ্যে মানুষের সম্মান ঘোষিত হবে।

শান্তনু দাস

প্রশ্ন

লিখো আমায় গায়ে কী দাও। পাও তো ঠিক ওম?
লিখো আমায় কেমন ঘুমোও। নরম তোশক পাও?
লিখো আমায় কেমন আছো। দেখতে একই রকম?
লিখো আমায় কী চাও তুমি। আমার দুহাত চাও?

বলো আমায় : একা থাকতে দেয় কি তোমায় ওরা?
বেরিয়ে আসতে পারো? ওদের পরের চালটা কী?
কী করছ? সেইটেই তো, উচিত যেটা করা?
কিসের কথা ভাবছ এখন বলো, সে কি আমি?
কেবল এসব প্রশ্নই তো করতে পারি, আর

যে-উত্তরই আসুক সেটা শুনে যেতেও হবে।
ক্লান্ত যদি হও তো আমার কী আছে করবার?
কিংবা যদি খিদেয় জ্বলো। তাই মনে হয়, কবে
পৃথিবীতে ছিলাম আমি। ছিলাম না কক্ষনো
আমার কাছে যেন তোমার স্মৃতিও নেই কোনো।

শঙ্খ ঘোষ

যে লিখেছিল

দেয়ালের উপরে শাদা খড়ি দিয়ে লেখা :
ওরা যুদ্ধ চায়।

যে লিখেছিল
সে প'ড়ে গেছে ইতিমধ্যে।

সমীর দাশগুপ্ত

বেয়াত্রিচেকে নিয়ে দান্তের লেখা কবিতাবলি বিষয়ে

এখনো ধূলিমলিন গোরস্থান যেখানে শায়িত
সেই রমণীটি যাকে কখনো হয় নি তাঁর পাওয়া
যদিও-বা তার পথে তাঁর সেই নিত্য টলে-যাওয়া
তার নাম আমাদের কাঁপায় হাওয়ার সঞ্চালনে
তাঁরও অভিপ্রায় ছিল তাকে নিয়ে লেখা কবিতায়
সমস্ত সময় আমরা তার নাম রাখি যেন মনে
তাঁর নামগানখানি আমাদের উৎসুক শ্রবণে
ধরে রাখি এই হোক আমাদের অদ্বিতীয় অধ্যবসায়

হায় কী অন্যায় দ্যাখো চালিয়ে দিলেন অকাতরে
তাঁর এই উচ্ছ্বসিত স্তবস্তুতি জনৈকাকে নিয়ে
যাকে মাত্র দেখেছেন, একবারও নেন নি যাচিয়ে

নিছক চোখে-দেখেই তাঁর গান, তাই তার পরে
রাস্তায় বাহারে-কিছু না-ভিজেই যদি পার হয়
তাকে ধরে নেওয়া হয় কামনার সুযোগ্য বিষয়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

রচনাকাল
১৯৩৮—১৯৫৬

একমাত্র দ্বিতীয় বিষয়টিই

এটা ধ'রে ফেলেছি : শুধু সুখী লোকদেরই
সবাই পছন্দ করে। তাদের কণ্ঠস্বর
কানে ভালো লাগে। তাদের মুখশ্রী আনন্দ জাগায়।

উঠোনের অষ্টাবক্র গাছ
অনুর্বর জমিকে শাপান্ত করে, অথচ
পথ-চলতি লোকেরা গাছকেই ঠাট্টা করে, এবং
যথার্থ-ই।

নৌকোর সবুজ হাল আর ঝিলিমিলি পাল ধ্বনিতে
অদৃশ্য হয়ে যায়। সবকিছুর মধ্যে
আমার চোখে থাকে শুধু ধীবরের জোড়াতালি জাল।
কার কথা আমি লিখবো—
কুঁড়েঘরে রমণীর ঝুলে-পড়া দেহ?
তরুণীর কুচযুগ
উষ্ণ, সে তো চিরকালই ছিলো।

আমার কবিতায় ছন্দ
মনে হয় একটা নিছক অভ্যাস
আমার মনের মধ্যে বোঝাপড়া করছে :
মঞ্জরিত আপেলতরুর খুশি
আর বাড়ির চুনকাম-মিস্ত্রির কথাবার্তার বিভীষিকা।
কিন্তু একমাত্র দ্বিতীয় বিষয়টিই
আমাকে টেনে নিয়ে যায় আমার লেখার টেবিলে।

সমীর দাশগুপ্ত

উপলব্ধি

যখন ফিরে এলাম
চুলে আমার পাক ধরেনি বলে
বেশ ভালই লাগল আমার
পর্বতরাজির টানাপোড়েন পড়ে রইল আমাদের পিছনে
সামনে আমাদের টানাপোড়েন সমতলের

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নূতন কালের বেশে

হঠাৎ করে নূতন যুগের শুরু হয় না
ঠাকুর্দা বেঁচে ছিলেন এ-কালের জগতে,
আমার নাতি হয়তো টিকে থাকবে
অতীতের জঠরে।

নতুন মাংসের কাবাব খাওয়া হয় পুরোনো কাঁটা দিয়ে।
প্রথম-তৈরি মোটরগাড়ি নয়,
আদ্যিকালের ট্যাঙ্কও নয় ওগুলো,
আমাদের ছাদের উপরে উড়ে-যাওয়া প্লেনগুলি
অতীতের নয়,
বোমাগুলোও তা নয় মোটে

নবতম বেতারযন্ত্রে বেজে চলেছে পুরোনো সব বোকা-বোকা কথা
এর মুখ থেকে ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ছে
জ্ঞানগম্ভীর বুক্‌নি।

সমীর দাশগুপ্ত

ভালোবাসার ক্ষয়

জননীরা জন্ম দিয়েছে যন্ত্রণা সয়ে, তোমরা নারীরা
যন্ত্রণায় গর্ভবতী হও।

রতিক্রীড়া ফলপ্রসূ হবে না আর, মিশ্রণে ভ্রূণ হবে শুধু,
আলিঙ্গন মাত্র মল্লযোদ্ধাদের আলিঙ্গন।
নারীরা হাত তুলেছে প্রতিরক্ষার জন্য
প্রভুরা যখন বাহুবন্ধনে উদ্যত।

গ্রামের গোয়ালিনী
আলিঙ্গন থেকে সুখভোগের যার অপার ক্ষমতা
উপহাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখে
বহুমূল্য পশুচর্মে ঢাকা অভাগিনী বোনেদের
প্রতিটি মসৃণ নিতম্বনৃত্যের জন্য যাদের পয়সা দেওয়া হয়।

অসীম ধৈর্যশীল নির্ঝর
বহু প্রজন্মকে তৃষ্ণার জল দিয়েছে,
ভয়ার্ত চোখে দেখে
শেষতম প্রজন্ম শেষ বিন্দু ছিনিয়ে নেয়
নাছোড় বিরক্ত মুখে
প্রতিটি পশু একাজে সক্ষম।
শুধু এদেরই জন্য এ দহন শিল্পের সমান।

সুনন্দা বসু
শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভালোবাসার গান

১

তুমি যখন প্রফুল্লতায় ভরাও
মাঝেমধ্যে ভাবনা আসে মনে
এখন যদি মরতে পারি আমি
সুখ থাকবে শেষের প্রহরক্ষণে।

তুমি যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে
ভাববে বসে আমার সব কথা
তোমার চোখে ভাসবে শুধু জেনো
আমার ছবি আজকে যেমন আঁকা।
যে প্রিয়া তখন তোমার বাহুডোরে
তারও বয়স কচি, হৃদয় কাঁচা।

২

গুল্মে ঠিক সাতটি গোলাপ
ছটির মালিক হাওয়া
একটি তবু রয়ে যাবে
আমার খোঁজার তরে।

সাতবার আমি ডাকব তোমায়
ছবার দূরে থেকো
সপ্তম ডাকে, কথা দাও
আসবে ছুটে আবার।

সুনন্দা বসু
শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

বসন্তপর্ব

বসন্তের পর্ব আগতপ্রায়
নারীপুরুষের যুগলক্রীড়ার নতুন সূচনা
প্রেমিক প্রেমিকারা লীলায় সম্মিলিত
প্রেমাস্পদের কোমল হাতের আলিঙ্গন পরশে
তরুণীর স্তন শিহরিত
তার চঞ্চল চাহনিতে পুরুষ বিহ্বল।

বসন্তের নতুন আভায়
প্রেমিকেরা নিসর্গ দেখে নতুন দৃষ্টিতে
অনেক উঁচুতে পাখীর প্রথম ঝাঁক দৃশ্যমান
সমীরণ উষ্ণমেদুর
দিনগুলি দীর্ঘায়িত
এবং প্রান্তরে আলো অনেকক্ষণ।

বৃক্ষ আর তৃণের কি অশেষ বিকাশ
এই বসন্তে,
বিরতিহীন ফুলের উৎস অরণ্য, প্রান্তর, ক্ষেত,
সব সতর্কতা ভুলে
ভুবন নতুনের জন্মদায়িনী।

সুনন্দা বসু
শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

অযথা নষ্ট, মূল্যবান সময়

আমি জানতাম, নির্মিত হয়েছে নগরনগরী
আমি সেসব জায়গায় যাই নি।
আমার মনে হয়েছে, তাদের জায়গা পরিসংখ্যানতত্ত্বে,
ইতিহাসে নয়।

জনতার প্রজ্ঞা দিয়ে তৈরি হয় নি এমন
সুন্দর নগরনগরী থাকলেই বা কী আসে যায়?

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দীর্ঘসময় নষ্ট হল

অনেক নগর গড়ে উঠেছে, আমি জানি,
সেখানে আমি যাইনি।
ভাবি আমি, এগুলো পরিসংখ্যানের সংখ্যা বাড়িয়েছে,
ইতিহাসে বিস্মৃত।
কিন্তু জনগণের প্রজ্ঞা বিনা গড়ে উঠেছে
এমন নগরও কি আছে?

অনুপ সাহা

একরাশ খুশি

সকালবেলার জানলা দিয়ে প্রথম দৃষ্টিপাত
ফিরে-পাওয়া পুরনো বই
উদ্দীপিত মুখের মেলা
তুষার, ঋতুবদল
কুকুর, খবরের কাগজ,
ডায়ালেকটিকস্‌
স্নান, সাঁতার
পুরনো গান
আরাম-দেওয়া জুতো
উপলব্ধি
নতুন গান
লেখা, গাছগাছালি
ভ্রমণ
গান-করা
বন্ধুজনোচিত হয়ে-ওঠা।

শঙ্খ ঘোষ

আমি সবসময় ভেবেছি

আমি সবসময় ভেবেছি : সেইসব শব্দই যথেষ্ট
যা সবচেয়ে সহজ। আমি যখন সবকিছুর কথা বলি
সকলের, বুকের ভেতরটা তখন নিশ্চয় ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে যায়।
নিজের পক্ষ নিয়ে না-দাঁড়ালে তুমি যে তলিয়ে যাবেই
তুমি নিশ্চয় সেটা বোঝো।

যুগান্তর চক্রবর্তী

একটি চৈনিক সিংহমূর্তি

দুর্জনেরা ভয় পায় তোমার নখ, আর
যারা ভালো তারা চোখ ভ'রে দ্যাখে তোমার মোহনরূপ,
এই একই কথা শুনতে পেলে
খুশি হব
আমার কবিতা সম্বন্ধেও।

সমীর দাশগুপ্ত

দূরদর্শিতার ফলশ্রুতি

দেখছি তুমি ঘোরাতে চাইছ তোমার গাড়িটা
সেই একই জায়গায় ফের—
যেখানে তাকে আগে ঘুরিয়েছিলে
আর সেখানকার মাটিটা ছিল নিটোল

এখন সে-চেষ্টা ক'র না, মনে রেখো—
একবার যেখানে গাড়ি ঘুরিয়েছিলে,
মাটিতে বসে গেছে চাকার গভীর ছাপ ;
এখন সেখানে তোমার গাড়ি আটকে যাবে।

সমীর দাশগুপ্ত

হলিউড

রোজগারের ধান্দায় রোজ রোজ
বাজারে যাই—যেখানে মিথ্যার বেসাতি ;
কপাল ঠুকে আমার জায়গাটুকু ক'রে নিই
বিক্রেতাদের দলে।

সমীর দাশগুপ্ত

যোগ্যতমের টিকে থাকা

জানি এটা নিতান্ত ভাগ্যের ব্যাপার—
অনেক বন্ধুর মৃত্যুকে পেরিয়ে আমি টিকে আছি,
কিন্তু কাল রাত্রে যখন স্বপ্নে শুনতে পেলাম তারা
আমার সম্বন্ধে বলছে : 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'—
আমার নিজের উপর ঘৃণা জাগল।

সমীর দাশগুপ্ত

জওয়ানের বৌ

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
পুরোনো শহর রাজধানী প্রাহা থেকে?
প্রাহা থেকে পেল পায়ের জন্য শুধু হিলতোলা জুতো
অভিনন্দন, সুখবর দ্রুত, আর হিলতোলা জুতো
পেয়ে গেছে বৌ রাজধানী প্রাহা থেকে।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
খাঁড়ির ওপারে অসলো শহর থেকে?
অসলো শহর থেকে পেল শুধু গায়ে জড়াবার ফার
আশা করি এতে সুখ হবে তার, গায়ে জড়াবার ফার
পেয়ে গেছে বৌ অসলো শহর থেকে।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
ধনীর শহর আমস্টারডাম থেকে?
আমস্টারডাম পাঠিয়েছে এক মাথায়-দেবার টুপি
এতে ওকে ভালো দেখাচ্ছে খুবই, ওলন্দাজের টুপি
পেয়ে গেছে বৌ আমস্টারডাম থেকে।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
বেলজিয়ামের ব্রুসেলস শহর থেকে?
ব্রুসেলস্ থেকে সে পেয়ে গেছে এক দুর্লভতম লেস
যা পেলে হৃদয়ে সুখ তো অশেষ, দুর্লভতম লেস
পেয়ে গেছে বৌ ব্রুসেলস শহর থেকে।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
আলো-ঝলমল পারীর শহর থেকে?
পারীর থেকে সে পেয়ে গেছে এক রেশমি কোমল গাউন
যার কথা নিয়ে মাতে গোটা টাউন, রেশমি কোমল গাউন
পেয়ে গেছে বৌ পারীর শহর থেকে।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
দক্ষিণ থেকে, দূর বুখারেস্ট থেকে?
বুখারেস্ট থেকে পেয়ে গেছে তার ঢিলেঢালা এক জামা
আজব মজার পা-অবধি-নামা, রুমানীয় এই জামা
পেয়ে গেছে বৌ দূর বুখারেস্ট থেকে।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
তুষারে তুষারে ভরা রুশদেশ থেকে?
রুশদেশ থেকে পেয়েছে সে তার বিধবার কালো বেশ
শোকাতুর তাকে মানিয়েছে বেশ, বিধবার কালো বেশ
পেয়ে গেছে বৌ তুষারের দেশ থেকে।

শঙ্খ ঘোষ

কী পেল সৈনিকের স্ত্রী?

সৈনিকের স্ত্রী কী পেল
পুরোনো রাজধানী প্রাহা থেকে?
প্রাহা থেকে এসেছিল তার উঁচু খুর-অলা জুতো,
শুভেচ্ছা, খোশ্‌খবর আর উঁচু খুর-অলা জুতো,
পেয়েছিল সে প্রাহা থেকে।

খাঁড়ির ওপারের অসলো থেকে
কী জুটেছিল সৈনিকের স্ত্রীর?
জুটেছিল ছোট্ট একটুকরো পশমিনা
খুশিতে থাকার মতো আশা, ছোট্ট এক টুকরো পশমিনা
পেয়েছিল সে শব্দের ওপার থেকে।

সম্পন্ন আম্‌সটারডাম থেকে
কী মিলেছিল সৈনিকের স্ত্রীর?
আমসটারডাম থেকে পেয়েছিল সে একটি টুপি
খাশা মানিয়েছিল তাকে, ঐ সুন্দর ডাচ টুপিতে—
যা সে পেয়েছিল আম্‌সটারডাম থেকে।

বেলজিয়ান শহর ব্রুসেলস থেকে
কী পেয়েছিল সৈনিকের স্ত্রী?
ব্রুসেলস্‌ থেকে সে পেয়েছিল একটা বাহারে লেস,
বেলজিয়ান শহর থেকে মিলে যাওয়া
লাখে-এক জাতের লেস কী দারুণ দিলখোশের ব্যাপার!

কী পেয়েছিল সৈনিকের স্ত্রী
আলোর শহর পারী থেকে?
পারী থেকে সে পেয়েছিল রেশমি জামা
তামাম শহরে ব'লে বেড়ানোর মতো
একটা রেশমি জামা পেয়েছিল সে আলোর শহর থেকে।

আর কী পেয়েছিল সৈনিকের স্ত্রী
দক্ষিণ—বুকারেস্ট—থেকে?

বুকারেস্ট থেকে এসেছিল তার ফ্রক
রুমানিয়ার বানানো একটা অদ্ভুত ঝলমলে ফ্রক
পেয়েছিল সে বুকারেস্ট থেকে।

আর তুষারের রাজ্য রাশিয়া থেকে
কী পেয়েছিল সৈনিকের স্ত্রী?
রাশিয়া থেকে পেয়েছিল বিধবার শোকের আঙরাখা
তার শোকের জন্য জরুরি সে পেয়েছিল আঙরাখা
তুষারের দেশ থেকে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ধোঁয়া

হ্রদের কিনারে গাছপালার নিচে ছোটো একটা বাড়ি
ছাদ দিয়ে উঠছে ধোঁয়া।
তা যদি না থাকত
কী দুর্দশাগ্রস্তই না হয়ে পড়ত
এই বাড়ি, গাছপালা আর হ্রদ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ধোঁয়া

দীঘির পাড়ে গাছপালার মধ্যে ছোট্ট বাড়িটি।
ছাদ বেয়ে ধোঁয়া উঠছে।
ওটুকু ছাড়া
কী বিশ্রীই না দেখাতো
বাড়ি, গাছপালা আর দীঘি।

যুগান্তর চক্রবর্তী

একটি কবিতা

এবার চলো হাল্কা পায়ে
আদ্যিকালের শহরে ঐ ভাঙা স্টেজে
ধৈর্য রাখো
নির্মমতায় দেখাও যখন
কোন্‌টা ঠিক।
বুদ্ধি করে খুলে বোঝাও
আহাম্মকি।
হৃদয় রেখো যখন রটে ঘৃণা।
হুমড়ি-খাওয়া বাড়িটাকে দিয়ে বোঝাও
প্ল্যানটা কেমন মূলেই ছিল গোলমেলে।
কিন্তু যারা বুঝবেই না
তাদের
কী আর ভরসা
সোনামুখই দেখাও।

শঙ্খ ঘোষ

হেলেনে ভাইগেল্‌কে

এই তো সময় তুমি চূর্ণ নগরীর
প্রত্নমঞ্চে পা রাখো সহজে
ধৈর্য আর অনম্য বিন্যাসে
দেখাও কোনটা সত্য
মূর্খতাকে প্রজ্ঞার মাধ্যমে
ঘৃণাকেও বন্ধুময়তায়
বিধ্বস্ত বাড়িটা জুড়ে
ভুল গৃহনির্মিতির রীতি
এবং গোঁয়ার যারা অশিক্ষিত তাদের দেখাও
এককণা আশা-ভরসায়
তোমার মহান মুখ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রত্যাবর্তন

আমার পিতৃপুরুষের ভিটে কী ক'রে চিনবো আমি?
বোমারু বিমান-ঝাঁক-অঙ্কিত পথ ধ'রে ধ'রে
বাড়ি আসলাম।
কোথায় শায়িত! প্রকাণ্ড ওই
ধোঁয়ার পাহাড় স্ফুরিত যেখানে,
সেখানে শিখার অভ্যন্তরে
দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কীভাবে আমায় গ্রহণ করবে আমার পিতৃভূমি?
বিমানগুলিও সামনে পড়লো এসে। মৃত্যুর ঝাঁক
ঘোষণা রাখলো আমার অভিগমনে। ক্ষ্যাপা দাবানলে
ফিরছে পুত্র পূর্বাধিকারে।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

ভাগ করে নাও আমাদের জয়োল্লাসকেও

আমাদের পরাজয়ের ভাগ নিয়েছিলে,
এবার ভাগ করে নাও
আমাদের জয়োল্লাস।
অনেক চোরাপথ থেকে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলে,
যে-সব পথে আমরা তথাপি হেঁটে গেছি।
তুমি কিন্তু আমাদের সঙ্গেই হেঁটেছ।

সমীর দাশগুপ্ত

লোহা

কাল রাত্রে স্বপ্নে
দেখি মহা ঝড় উঠেছে।
চেপে ধরল মাচা-মাচান্‌
ছিঁড়ে দিলে সব
নিরেট লোহার থামবরগা।
কিন্তু যা কিছু ছিল কাঠের তৈরি
নু'য়ে পড়ল আর থেকে গেল।

বিষ্ণু দে

লোহা

গতরাত্রের স্বপ্নে দেখেছি
প্রবল বাতাস ফুঁসছে ক্রোধে।
উঁচু মঞ্চকে পেঁচিয়েছে তার বজ্রমুঠি,
খান খান ক'রে ছিটকে দিয়েছে
যতেক নিরেট লোহার খুঁটি।
কাঠের তৈরী যা-কিছু কিন্তু
নুয়ে ঝুঁকে প'ড়ে অটুট ঠিক।

সামসুল হক

এখনো

বাড়ি ঘরের দেয়াল ছাদে চিত্র আঁকে এমন একজন
শুভ সময় ভালো সময় আসার কথা বলে।

গাছগাছালি এখনো রোজ বাড়ে।
মাঠগুলি সব শস্য করে ধারণ।

সহর নগর এখনো স্থির খাড়া।
মানুষগুলি শ্বাস-প্রশ্বাস এখনো নেয়, ছাড়ে।

সাগর চক্রবর্তী

১৯৩৯ : রাইখ্ থেকে একটি ছোট খবর

চুনকাম-মিস্ত্রিটা শোনাচ্ছে উজ্জ্বল সব আগামী দিনের কথা।
অরণ্যে বৃক্ষেরা এখনো বাড়ে।
মাঠে মাঠে আজো ফসল ধরে।
শহরগুলিও ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।
মানুষ এখনো নিঃশ্বাস টেনে নেয় দেহে।

সমীর দাশগুপ্ত

খঞ্জের লাঠিজোড়া

একবারও ঠিক চলনে চলিনি তা প্রায় সাত বছর
যেই দেখিয়েছি ডাক্তার নাম-করা
তিনি বললেন : 'কেন রেখেছিস এই ক্রাচজোড়া তোর?'
আমি বললাম : মহাশয়, আমি খোঁড়া

তিনি বললেন : 'সে তো শাদা কথা ওরে,
পরখ করার দেখিয়ে দে বাহাদুরি,
তোকে শুধু এই বাজে জিনিসটা রেখেছে খঞ্জ করে,
চতুশ্চরণে দিয়ে ফেল হামাগুড়ি।'

বলেই বেমমোদত্যির মতো হেসে
নিল সে আমার ক্রাচজোড়া সুন্দর
এবং ভাঙল আমারই পৃষ্ঠদেশে
আগুনে ঝোঁটিয়ে উঠল হেসে তুখোড়।

ফলত এখন যেতে পারি বেশ নেই কোনো আধিব্যাধি,
অট্টহাসিতে এ আমার নিরাময়,
শুধু কখনো-বা কাঠ দেখে ফেলি যদি
ঈষৎ খুঁড়িয়ে বেড়াই ঘণ্টা কয়

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অন্ধকার দিন

অন্ধকার দিনগুলিতে
তখনও কি গান থাকবে কোনো?
অবশ্যই থাকবে তখন গান
অন্ধকার দিনের।

শঙ্খ ঘোষ

মূলমন্ত্র

এই, তবে, এই-ই সব। যথেষ্ট তা' নয়, আমি জানি।
অন্তত এখনো আমি বেঁচে আছি, সে তুমিও জানো।
আমি যেন সেই লোক একটি ইট তুলে যে দেখায়
কেমন সুন্দর তার গৃহখানি ছিল একদিন।

যুগান্তর চক্রবর্তী

অনায়াসে

দ্যাখো কী অবলীলায়
প্রবল নদী দু-পাড়ের মাটি ভেঙে ভেঙে চলে,
ভূমিকম্পের অলস হাত
মাটিকে উথালপাথাল করে,
প্রলয়ংকর আগুন অনায়াসে বাড়ায় হাত
শহরের অগুনতি অট্টালিকার গায়ে
আর তাদের গ্রাস ক'রে নেয় অফুরন্ত অবসরে।
কী মসৃণ খাদক!

সমীর দাশগুপ্ত

দুঃসময়ের প্রণয়গীতি

আমাদের মধ্যে ভাব ভালোবাসা ছিল না তেমন কিছু,
তবুও অন্য দম্পতিদের মতো আমরাও করেছি রমণ,
আর রাত কেটে গেছে পরস্পরের বাহুতে মাথা রেখে,
চাঁদকে মনে হয় নি তোমার চেয়ে অচেনা।

আর আজ তোমাকে যদি হঠাৎ দেখি বাজারে,
আর দুজনেই কিনি মাছ, তাতে ঘটে যেতে পারে কলহ :
আমাদের মধ্যে ছিল না মনের টান
রাতে ঘুমিয়েছি পরস্পরের বাহুতে মাথা রেখে।

সমীর দাশগুপ্ত

শক্তিশালী এক রাষ্ট্রনায়কের অসুখ হয়েছে এই সমাচার শুনে

যখন অপরিহার্য একটি লোক ভ্রূকুঞ্চন করে
দুলে ওঠে বিশ্বময় সাম্রাজ্য
অপরিহার্য সেই লোকটি যখন অক্কা পায়
দুনিয়াটা এমন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়
যেন এক মা, ছেলের জন্য সুখ জোগানোর সামর্থ্য নেই যার
আর অপরিহার্য সেই লোকটি যদি
তার মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পরে ফিরে আসে
গোটা রাজ্যে তার জন্য
এমন-কি একটি দারোয়ানের কাজও জুটবে না

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সব কিছুই বদলে যায়

সব কিছুই তো বদলে যায়। তোমার শেষ নিঃশ্বাস থেকে
ফের শুরু করতে পার তোমার জীবন।
কিন্তু যা হয়ে গেছে তা হয়েই গেছে। যে-জল
একবার সুরাপাত্রে ঢালা হয়ে গেছে
তা ছেঁকে ফেলে দেওয়া যাবে না।

যা হয়ে গেছে তা হয়েই গেছে। যে-জল
একবার সুরাপাত্র ঢালা হয়ে গেছে
তা ছেঁকে ফেলে দেওয়া যাবে না। অথচ
সব কিছুই বদলে যায়। ইচ্ছে হলে
ফের শুরু করতে পার তোমার শেষ নিঃশ্বাস থেকে।

সমীর দাশগুপ্ত

সমাধান

১৭ই জুনের সেই উত্থানের পরে
সম্পাদক, লেখকসংসদ
ইস্তাহার ছড়ালেন স্টালিনসড়কে
ইস্তাহারে ছিল, জনগণ
সরকারের আস্থা হারিয়েছে—
দুইগুণ শ্রম করে
একমাত্র হৃত আস্থা ফিরে পেতে পারে। তাহলে তার থেকে
অনেক সহজ কাজ সরকারের পক্ষে হত নাকি
জনগণকেই ভেঙে দিয়ে
অন্য নির্বাচন?

শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়

মুশ্‌কিল আসান

১৭ই জুনের অভ্যুত্থানের পর
লেখক সমিতির সচিবমশাই
স্তালিন সরণীতে বিলি করিয়েছিলেন ইশতেহার
তাতে লেখা ছিল, জনতা
সরকারের আস্থা নষ্ট করেছে
এবং একমাত্র দ্বিগুণ পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই
সেই আস্থা আবার অর্জিত হতে পারে। তাহলে বরং
সরকারের পক্ষে
জনতাকে বাতিল করে দিয়ে
আরেক জনতাকে নির্বাচন করে নিলেই ব্যাপারটা কি আরো সহজ হত না?

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শিশুদের ধর্মযুদ্ধ, ১৯৩৯

উনচল্লিশে পোল্যাণ্ডে ঘটেছিল
রক্তে ঢালাই যুদ্ধের কারবার।
অনেক শহর, অসংখ্য ছোট গ্রাম
উনচল্লিশে হয়ে গেল ছারখার।

উনচল্লিশে ভাইকে হারালো বোন,
যুদ্ধে বৌ-টি হারালো স্বামীকে তার।
খোকাবাবু ঘোরে আগুন-ছাইয়ের মাঝে
মা ও বাবাকে খুঁজে পায়নাকো আর।

পোল্যাণ্ড থেকে তো খবর বন্ধ হল,
চিঠি তো বটেই, ছাপা কথা হল মানা।
তবুও এখানে পুবদিকে সব দেশে
অবাক গল্প পথেঘাটে গেল জানা।

গল্পটি ওরা যখন বলত খুলে,
—শিশুদের সেই ধর্মযুদ্ধ নিয়ে,
পোল্যাণ্ডে যার শুরু উনচল্লিশে,—
শীত ঢেকে দিত পুবের শহর তুষারের ঢাকা দিয়ে।

বড় রাস্তায় সারি করে দল বেঁধে
উপবাসী ঐ শিশুরা খুঁড়িয়ে চলে।
পথে যেতে যেতে লুণ্ঠিত ভাঙা গাঁয়ে
নতুন সভ্য যোগ দেয় এসে দলে।

মারামারি থেকে পালাতে চেয়েছে তারা
এ বিভীষিকায় খুঁজেছিল ক্ষান্তিকে।
ভেবেছিল তারা খুঁজে পাবে একদিন,
সে দেশ যেখানে পাবে তারা শান্তিকে।

তাদের একটা সর্দার ছিল খুদে,
সে ছিল তাদের ভরসা এবং খুঁটি।
এ সর্দারের একটিই মাথাব্যথা
অজ্ঞাত ছিল পথের নিশানা দুটি।

একরত্তি এ একাদশী এক মেয়ে
চারবছরের বাচ্চাকে নিয়ে চলায় নেইতো শেষ।
মাতৃত্বের পনেরো আনাই পুরো,
বাকী শুধু ছিল অশান্তিহীন ছোট্ট একটি দেশ।

ইহুদীর ছেলে হাঁটছিল এই দলে।
গলায়, হাতায় ভেলভেট ছিল তার,
ধপ্‌ধপে সাদা রুটি খাওয়া অভ্যাস।
তবুও সেও তো লড়েছিল জোরদার।

আর দুই ভাই যোগ দিল সেনাদলে,
দুজনেরই মাথা অজস্র প্যাঁচে ভরা।
বৃষ্টির সাথে ল'ড়ে ভাঙা এক কুঁড়ে
ঝড়ের মতন দখল করল তারা।

হাঁটছিল এক সভ্য সে রোগা কালো,
পথের ধারেতে, আলাদা ও একা একা,—
দুর্বহ বোঝা অপরাধ তার এই
কাঁধে এক তার নাৎসী চিহ্ন লেখা।

তাদের মধ্যে এক ছিল সুরকার
ঢোলক একটা পেয়েছিল খুঁজে ভাঙাচোরা এক গাঁয়ে:
ছিল না সেটাকে বাজানোর অনুমতি
পাছে শব্দতে তারা ধরা পড়ে যায়।

ছোট্ট একটা কুকুরও ছিল এ দলে,
ঠিক ছিল সেটা হাড়িকাঠে হবে বাঁধা।
হল সে শেষটা খাবারের ভাগীদার,
যেহেতু সকলে মনে মনে দিল বাধা।

তাদের একটা ইস্কুলও ছিল খোলা।
খুদে মাস্টার জানত : চেঁচানো মানেই শিক্ষাদান।
ছাত্র একটি ভাঙা ট্যাঙ্কের গায়ে
লিখতে পারত শানতির শুধু 'শান'...।

গানবাজনাও হয়েছিল একদিন :
গর্জনশালী শীতের নদীর পাশে
একজন বসে ড্রামটা বাজালো কষে.
বড়ই দুঃখ কেউই শুনল না সে।

প্রেমের নজিরও ছিল বটে একখানা।
মেয়েটি বারো ও ছেলেটি পনেরো বছর,
নির্জন এক ভাঙা উঠোনের মাঝে
মেয়েটি ছেলের চুল আঁচড়ায় চাঁচর।

বেশিদিন ধরে টিকল নাকো এ প্রেম,
দিনগুলি ক্রমে ঠাণ্ডায় এলো জমে।
ছোট্টগাছই বা কী করে ফোটাবে ফুল,
তুষারের ঝড় কখনো যদি না কমে?

ছোটখাটো এক যুদ্ধও হল, যবে
এদের মতন আরেকটা দল এলো।
ওদের যুদ্ধ সহজে খতম হল,
যেহেতু নেহাৎই 'অর্থহীন' ও খেলো।

কিন্তু যখন যুদ্ধ চলছে জোর,
বোমায় ভগ্ন, পয়েন্টসম্যানের কুঁড়েঘরটাকে ঘিরে,—
লক্ষ করলে একটা দলের লোকে
খাবার আনার লোক আসছে না ফিরে।

অন্যদলের সেনারা শুনে সে কথা
একটা লোককে পাঠালো তাদের কাছে,
কাঁধে তার দিল বস্তাভর্তি আলু,
খাবার অভাবে যুদ্ধটা মরে পাছে।

একটা বিচারও হয়েছিল এক রাতে।
আলোর জন্য দুটো মোমবাতি জ্বলে।
অনেক জটিল বিচারের পর সবে
ঘোষণা ক'রলে বিচারক দোষী ব'লে।

একটি ছেলের শবযাত্রাও হল
গলায় ও হাতে ভেলভেট ছিল যার।
দুজন পোল ও দুই জার্মান মিলে
বয়ে নিয়ে তাকে রাখল কবরে তার।

প্রোটেস্টান্ট ও নাৎসী ও ক্যাথলিক,
সকলেই ছিল, যখন নামালো তাকে।
সব শেষে এক খুদে সোস্যালিস্ট উঠে
জীবিত সবার ভবিষ্যৎকে দু'চার কথায় আঁকে।

আশাবিশ্বাস অভাব ছিল না মোটে
মাংস ও গম, অভাব মাত্র দুটি।
তাদের দুষো না আশ্রয় নেই শুনে
যদি চুরি করে তোমার একটা রুটি।

আর, কেউ যেন গরীবকেও না দোষে।
রুটি-ভাত দেওয়া কুলোয় না ক্ষমতায়,
পঞ্চাশজন খাওয়াতে যা লাগে সেটা
নেহাৎই ময়দা, আত্মত্যাগ নয়।

মোটামুটি তারা দক্ষিণে চলছিল।
দক্ষিণদেশে—রক্তসূর্য যেথা।
দুপুরবেলায় ঠিক বারোটার কালে
সূর্য যেথায় মাথার ওপরে, সেথা।

অবশ্য তারা এক সৈন্যকে পেলো,
আহত হয়ে সে পড়েছিল ফার গাছে,
সাতদিন ধরে করলে প্রচুর সেবা
যাতে জানা যায় পথটা কোথায় আছে।

বলল সে শেষে : 'বিলগোরে চলে যাও!'
জ্বরের বিকার অনেক গড়িয়েছিল।
অষ্টমদিনে মৃত সেনাটিকে ওরা
কবরে শুইয়ে আবার এগিয়েছিল।

পথেই অনেক নিশানার পোস্ট ছিল
যদিও তুষারে কালিটা গিয়েছে ধুয়ে
আর সে নিশানা ঠিক পথ দেখাতো না,
সেগুলো যে ছিল দুমড়িয়ে বেঁকে নুয়ে।

মর্মান্তিক ঠাট্টা কোনো এ নয়,
প্রচলিত এক যুদ্ধেরই এই প্রথা।
অনেক ঘুরেও তবু হলনাকো জানা
বিলগোরে বলে জায়গাটা হবে কোথা।

দাঁড়াল নেতাকে চারদিক থেকে ঘিরে।
নেতাটি সামনে বরফ-হাওয়ার ঘোরে
ছোট্ট হাতটা মহা কায়দায় তুলে
বললে, 'ওদিকে হবে এই বিলগোরে'।

একরাতে এক আগুন দেখলে তারা
'না যাওয়াই ভালো', তারা ঠিক করে নিল।
একবার তিন ট্যাঙ্ক গেল পাশ দিয়ে,
প্রতিটির মাঝে কিছু করে লোক ছিল।

একবার তারা শহরের কাছে এলো,
এড়িয়ে এগোলো শহরটা রেখে ধারে।
যতদিনে তারা অনেকটা এগিয়েছে
ততদিন তারা চলল অন্ধকারে।

আগে যেটা ছিল দক্ষিণপুব পোল্যাণ্ড
তুষার সে দেশে মুছল সবুজ লেখা,—
পঞ্চান্নটি শিশুর দলকে সেই
সেখানে তখন শেষবার গেছে দেখা।

আমি যদি শুধু দুটো চোখ বুজে ভাবি
তাদের চলাটা চোখের সামনে ফোটে!
বোমায় চূর্ণ একটি বাড়ির থেকে
বোমায় চূর্ণ আরেক বাড়িতে ওঠে।

তাদের ওপরে মেঘের রাজ্যে দেখি
আরও কত সব লম্বা লাইন মেলে
খুঁড়িয়ে চলেছে, শীতল বাতাস মুখে,
ঘরছাড়া আর পথহারা সব ছেলে।

খুঁজে ফেরে তারা শান্তিপূর্ণ দেশ,
আগুন এবং বজ্রের দ্যুতিহীন,
যেদেশ ছেড়েছে সেদেশের মতো নয় ;
শোভাযাত্রাটা বেড়ে চলে দিনদিন।

তারপরে সেই আলো আঁধারির মাঝে
সন্দেহ হয় : সবাই তো এক নয়!
আধচেনা সব আরো কচিমুখ দেখি,
স্প্যানিশ, ফরাসী, পীতকায়ও মনে হয়।

জানুয়ারী মাসে পোল্যাণ্ডে সেবছরে
ঘরছাড়া এক কুকুর পড়ল ধরা।
ঝুলছিল তার শীর্ণ গলায় লেখা
পিচবোর্ড এক, হস্তাক্ষরে ভরা।

তাতে ছিল লেখা : 'বাঁচাও এখানে এসে
পথ হারিয়েছি আমরা এখানে সবে।
আমরা এখানে পঞ্চান্নটি প্রাণ
চেয়ে বসে আছি কুকুর ফিরবে কবে।

'একে গুলি করে মেরো নাকো কভু যেন,
ঠিকানা ও পথ ভালো জানা আছে এর,
এর ওপরেই আমাদের নির্ভর,
জীবনের শেষ ভরসা এ আমাদের'।

বাচ্চার লেখা অক্ষরগুলো কাঁচা।
কয়েকটি চাষী পড়েছিল ধরে ধরে।
তারপর থেকে দেড়বছর তো হল
উপবাসী সেই কুকুরটা গেছে মরে।

বিষ্ণু দে

পূর্ব রণাঙ্গণে যুদ্ধরত জার্মান সৈনিকদের প্রতি

আমার প্রিয় বন্ধুরা, যদি আজ আমি তোমাদের মধ্যে থাকতাম
যদি সুদূর পূর্বসীমান্তে তুষারমণ্ডিত রণক্ষেত্রে তোমাদেরই একজন হতাম,
হতাম লৌহশকট পরিবৃত তোমাদের মত হাজারো সৈন্যের একজন,
তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের মতই বলতাম :
অবশেষে নিশ্চয়ই আমরা ফিরে যাব আমাদের প্রিয়জনদের মধ্যে।
কিন্তু বন্ধুরা, আমার প্রিয় বন্ধুরা,
লৌহশিরস্ত্রাণের নিচে, মাথার মণিকোঠার মধ্যে
আমি কিন্তু জানতাম, ঠিক যেমনটি আজ তোমরাও জানো,
বাড়ি ফেরার পথ আমাদের চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে।
স্কুলে-পড়া মানচিত্রে যখন বিভিন্ন দেশের অবস্থান দেখি,
তখন মনে হয় স্মোলেনস্ক শহরটি কত কাছে—
ফ্যুয়েরারের ছোট্ট আঙুলটির দৈর্ঘ্যের চেয়েও কম দূরে,
অথচ এই বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্রে কিন্তু শহরটির দূরত্ব অনেক,
শহরটি অনেক অনেক দূরে।

তুষারপাত কিন্তু চিরন্তন নয়, বসন্তকাল আসা পর্যন্তই তার দাপট,
সৈন্যদের জীবনও ত চিরদিনের নয়, আগামী বসন্তকাল পর্যন্তও
সে কিন্তু টিকে থাকতে পারবে না।
আমারও মৃত্যু হবে সেকথা আমি ভালভাবেই জানি
এবং পরদেশলুণ্ঠনকারী হিসেবেই আমার মৃত্যু হবে
মরতে হবে নির্মম হত্যাকারীর পোশাকে।
হাজার হাজার হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারীর একজনরূপে চিহ্নিত করেই
আমার ওপর নেমে আসবে চরম আঘাত, আমাকে হত্যা করা হবে।
প্রিয় বন্ধুরা আমার, আমি যদি তোমাদের মত একজন হতাম
তবে তোমাদের সাথেই তুষারস্তূপের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতাম
আর তখন তোমাদের মতই আমিও প্রশ্ন করতাম :
কেন, কী উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আনা হয়েছে,
যেখান থেকে বাড়ি ফেরার সমস্ত পথই আমাদের বন্ধ?
কেন আমি নির্মম হত্যাকারীর পোশাক পরেছি?
অবশ্যই আমি ক্ষুধার জ্বালায় এ কাজ করছি না,
এ কাজ করছি না আমার হত্যাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে।

এর একটি মাত্রই কারণ : আজ আমি আজ্ঞাবাহী ক্রীতদাস,
আমাকে আদেশ করা হয়েছিল
আর আমি হত্যাকারীর পোশাক পরে নিয়েছিলাম।
এবং ঠিক সেই জন্যই আজ আমি মৃত্যুর সম্মুখীন
আমাকে হত্যা করা হবে নির্মমভাবে।
যেহেতু আমি আজ সেই দেশটিরই ধ্বংসকারীরূপে চিহ্নিত
যে-দেশটি শান্তিপ্রিয় কৃষক শ্রমিকদের দেশ
যার মহান কর্মকাণ্ডে বিধৃত হচ্ছে নিরলস সৃষ্টির প্রয়াস
যার শস্যক্ষেত্র আর গোলাঘরগুলি আমরা চূর্ণবিচূর্ণ করেছি
মিল, কারখানা, বাঁধগুলিকে করেছি ধ্বংস
শতসহস্র মনীষীর মহান শিক্ষাকে করেছি পদদলিত
আর অবমাননা করেছি মহান ব্যক্তিদের সমবেত চিন্তার সিদ্ধান্তগুলিকে।
তাই আজ আমাকে মরতে হবে ইঁদুরের মতো
যে ইঁদুরটা ধরা পড়েছে এক কৃষকের ফাঁদে।
আমাকে দিয়েই আজ পরিষ্কার করা হবে
পৃথিবীর জঞ্জাল, বিষাক্ত কুষ্ঠব্যাধি,
একটা উদাহরণ তৈরী করা হবে
ভবিষ্যতের জন্য আমাকে দিয়ে—
কোন ব্যবস্থা নিতে হবে হত্যাকারী আর লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে
আর যারা তাদেরই ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে।
চারিদিকে মাতৃহৃদয়ের ক্রন্দন, তাদের সন্তানেরা আর ফিরে এলো না
শিশুরা বলছে—সবাই তারা আজ পিতৃহীন
ধ্বংসস্তূপের কাছে এই হাহাকারের কোন জবাব মিলছে না।
এবং আমি আর দেখতে পাব না, সেই দেশ
আমার প্রিয় দেশ, যে-দেশে আমি জন্মেছি
ব্যাভেরিয়ার সেই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, দক্ষিণের পর্বতমালা
সেই সমুদ্র, সবুজ তৃণভূমি, পাইনের সারি,
শান্ত জনপদে প্রবহমান নদীতীরের সেই আঙ্গুরগুচ্ছ
অন্ধকার ভেদ করে ঊষার আগমন, মধ্যাহ্ন,
দিনান্তে সন্ধ্যার অভিসার।
সেই শহরগুলো আর সেই শহরটা, যেখানে আমি জন্মেছি
আমার সেই কাজ করার বেঞ্চিটা, আর সেই ঘরটা
আর সেই টুলটা—আমি আর কখনো দেখতে পাব না।
এর কিছুই আমি আর দেখতে পাব না

আর যারা আমার সঙ্গে এসেছে
তারাও কেউ একটি বারের জন্যও তা দেখতে পাবে না
তুমি আমি কেউ-আর আমাদের প্রেয়সী বা মায়েদের
সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পাব না
কিংবা শুনতে পাব না গ্রামের চিমনিতে ধাক্কা-লাগা হাওয়ার শব্দ
অথবা শহরের সেই মিষ্টি হট্টগোল আর বিশ্রী আওয়াজ।
একটি বছরের মধ্যেই হয়তো আমি মারা যাব
কিন্তু জেনে রেখো আমি জীবনে একবারও ভালবাসা পাইনি
আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি, অস্ত্রে পরিণত হয়েছি এক কপট দেশচালকের।
আমার প্রকৃত শিক্ষা ছিল না, শেষ মুহূর্তে তা বুঝতে পারছি
হত্যা ছাড়া আমার আর কোন বিদ্যাতেই হাতে খড়ি হয়নি
জল্লাদগুলোর কাছ থেকে ওর বেশি শেখার কিছু নেই।
যে-পৃথিবীকে আমি বিধ্বস্ত করেছি
তারই মাটির নিচেই আমার কবর হবে
আমি এক দুর্বৃত্ত আমার ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান নেই
তাই কবরে আমার সঙ্গী হবে শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস।
আর মাটির নিচেই বা কেমন হবে আমার অবস্থান
একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে যেন পচন-ধরা একশ কেজি মাংসপিণ্ড,
তারও পরের অবস্থাটা কি?
যেন একটা শুকনো জড়পদার্থ দলা পাকিয়ে আছে
একটা মাটির মণ্ড, যাকে শাবল দিয়ে তোলা হয়েছে
আর তার পচা গন্ধ চতুর্দিকে হাওয়ায় হাওয়ায় 'ম' 'ম' করছে।
আমার প্রিয় বন্ধুরা, আজ যদি আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতাম
সেই সুদূর স্মোলেন্‌স্কের পথে
তারপর সেই স্মোলেন্‌স্ক থেকে এক অজানা পথে
আমি নিশ্চয়ই তেমনটিই অনুভব করতাম, যেমন তোমরা করছ
লৌহশিরস্ত্রাণের নিচে, মাথার মণিকোঠার মধ্যে এই চিন্তাই আমার হতো,
অন্যায় সর্বদা অন্যায়ই!
দু' দু' গুণে চারই হয়।
তোমাদের সঙ্গে যারা গেছে তারা অবশ্যই মারা যাবে
সেই রক্তপিপাসু দস্যুর দল,
হত্যাকারী নির্বোধের দল।
তারা জানত না মস্কো শহর অনেক দূরে
অনেক অনেক দূরে,

জানত না পুবের দেশগুলিতে শীত কী প্রচণ্ড,
শীত কত তীব্র।
আর সেই নতুন কৃষক ও শ্রমিকের রাষ্ট্রটি
তাদের গ্রাম ও শহরগুলিকে রক্ষা করবে
আর আমাদের তারা নিশ্চিহ্ন করে দেবে
জঙ্গলের মধ্যে কামানের সারির পেছনে
রাস্তায় আর বাড়ির মধ্যে
ট্যাঙ্কগুলির নিচে আর পথের মোড়ে মোড়ে
সেই রাতের কঠিন শীতে, অনাহারে
আমাদের হত্যা করবে সেই দেশের পুরুষ, নারী আর শিশুরা।
এমনি করে আমরা সবাই মারা যাব
আজ কিংবা কাল কিংবা পরের দিন
তুমি আমি এবং ওই জেনারেল সবাই।
কারণ, আমরা তাকেই ধ্বংস করতে চেয়েছি
যার সৃষ্টি মানুষের মহৎ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে।
যেহেতু কঠোর পরিশ্রমেই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি
যেহেতু একটি গৃহনির্মাণেও যথেষ্ট শ্রমের প্রয়োজন
লোহার কড়ি-বরগা সরাতে বা বাড়ির নক্শা আঁকতে
একটা দেওয়াল তৈরী করতে, ছাদ ঢালাই করতে
আমরা অনেক পরিশ্রম করি। কারণ, আশা আমাদের সুদূরপ্রসারী।
মানুষের সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে দেওয়া হবে না—
গত হাজার বছর ধরে একথাটা শুধু ঠাট্টার মতো বেজেছে
কিন্তু আজ সমস্ত মহাদেশেই এই কথা ছড়িয়ে পড়েছে :
যে-পদযুগল নতুন ট্রাক্টরের চক্র-চিহ্নিত জমিকে পদদলিত করবে
তাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে
যে-হাত নতুন শহরনির্মাতাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হবে
সে-হাত টুকরো করে ফেলা হবে!

অমল মুখোপাধ্যায়

১৯৪০

১
বসন্ত এসেছে। মৃদু বাতাস এখন
শীতের তুষার থেকে দ্বীপপুঞ্জ মুক্ত করে দেয়
উত্তরের মানুষ তবুও কাঁপে কন্‌কনে ভয়ে
এক্ষুনি এসে পড়বে যুদ্ধবাজ নৌবাহিনী চুনকামঅলার

৪
কুয়াশা ঢেকে দিচ্ছে
রাস্তাঘাট
পপলার
খামারবাড়ি আর

৬
আমার ছোটো ছেলে আমাকে জিগ্‌গেস করে বসেছে : আমি কি গণিত শিখব?
কীজন্য, এই প্রশ্ন করতে আমার ইচ্ছে হয়, দু-টুকরো রুটি এক টুকরো রুটির চাইতে বড়ো
এই কারণে?
সেটা তো তোর নজরে পড়বে এমনিতেই।
ছোটো ছেলে আমার জিগগেস করে আমায় : আমাকে কি ফরাসি শিখতে হবে?
কেন, প্রশ্ন করতে আমার ইচ্ছে হয় : এই রাজত্বের পতন হবেই হবে। আর
পেটের ওপর হাত বুলিয়ে যদি গোঙানি শুরু করে দিস
লোকে তোর মনের কথাটা বুঝে নিতে পারবে।
আমার ছোটো ছেলে প্রশ্ন করে বসে আমাকে : আমাকে কি ইতিহাস নিয়েও পড়াশুনো করতে হবে?
কেন, জানতে আমার ইচ্ছে হয়। মাথাটা মাটির মধ্যে কী করে সেঁধিয়ে দিতে হয়
সেটা শিখে নে, আর তাহলেই তুই উদ্বৃত্ত হয়ে টিকে থাকতে পারবি।

যা শেখ্‌গে গণিতশাস্ত্র, বলে উঠি আমি
শেখ্ ফরাসি ভাষা, পড়ে রাখ ইতিহাস

৭
হালকা শাদায় চুনকাম-করা দেয়ালের সামনে
কালো একটা সৈন্যদের সুটকেশ তাতে ভর্তি পাণ্ডুলিপি
তার উপর তামাকপাতি আর আমার ছাইদানি একটা
চীনা দীঘলপট, সন্দেহগ্রস্ত একটি মানুষ
ঝুলছে তার ছবি। এবং কয়েকটা মুখোশ। খাটের সামনে
ছয়বাতিঅলা লাউডস্পীকার।
রেডিও খুলে শুনি
আমার শত্রুদের জয়ের ঘোষণা

৮
আমার দেশবাসীদের কাছ থেকে পালিয়ে
পৌঁচেছি এখন ফিনল্যাণ্ডে। গতকাল পর্যন্ত
যে-সব বন্ধুকে চিনতাম না তারাই
পরিচ্ছন্ন ঘরে পেতে দিল কয়েকটা বিছানা।
লাউডস্পীকারে থেকে-থেকে অতি-উচ্ছন্নে-যাওয়া মানুষদের বিজয়ঘোষণা।
কৌতূহলবশে ভূমণ্ডলের মানচিত্র খুলে ধরি। উপরের ল্যাপল্যাণ্ড থেকে
উত্তরে মেরুসাগর পর্যন্ত
দেখতে পাচ্ছি এখনো যেন একটা দরজা খোলা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

১৯৪০, ৬-সংখ্যক

আমার ছোট্ট ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে :
আমি কি অঙ্ক শিখবো?
কী দরকার তার, আমার বলতে ইচ্ছে হয়। দু'-টুকরো রুটি যে
এক-টুকরোর চেয়ে বেশি
সে তুমি এমনিতেই বুঝতে পারবে।
আমার ছোট্ট ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে :
আমি কি ইংরেজি শিখবো?
কী দরকার তার, আমার বলতে ইচ্ছে হয়। ওদের সাম্রাজ্যটা তো
ভেঙে পড়ছে।

স্রেফ পেটে হাত বুলোও আর গোঙাও
তাতে ঠিকই বোঝা যাবে তুমি কি বলতে চাইছো।
আমার ছোট্ট ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে :
আমি কি ইতিহাস শিখবো?
কী দরকার তার, আমার বলতে ইচ্ছে হয়। মাটিতে মুখ গুঁজে
পড়ে থাকতে শিখলেই
শেষ পর্যন্ত টিকেও যেতে পারো এ-যাত্রা।

হ্যাঁ, শেখো গিয়ে অঙ্ক, আমি তাকে বলি
শেখো ইংরেজি, শেখো ইতিহাস!

যুগান্তর চক্রবর্তী

রুস্‌কানেন্‌-এর ঘোড়া

যখন বিশ্বসঙ্কট তৃতীয় শীতে পড়লো
নিভালার চাষীরা আগের মতই গাছ কাটতে লাগলো
আর আগের মতই ছোট ঘোড়ারা সেই কাঠ
টেনে নিয়ে চললো নদী পর্যন্ত; কিন্তু এ-বছর
গুঁড়ি পিছু তাদের জন্য ধার্য হ'ল পাঁচ ফিন-মার্ক, যা
একটা সাবানের দাম। আর তারপর যখন
বিশ্বসঙ্কটের চতুর্থ বসন্ত এলো, সে-হেমন্তেও যারা কর
পরিশোধ করেনি তাদের কুঁড়েঘরগুলো নিলামে চড়ানো হ'ল।
ওদিকে যারা চুকিয়ে দিল ট্যাক্‌সো, তারা তাদের
ঘোড়ার জন্য জাব্‌না কিনতে পারলো না। রসদের অভাবে
তারা মাঠে বা জঙ্গলে কোথাও খাটতে পারলো না।
তাদের জিলজিলে চামড়া খর্বুটে পাঁজরায় লেপ্‌টে গেল।
তখন নিভালার মুখিয়া
অবতীর্ণ হ'লেন চাষী রুসকানেনের খেতে এবং
তাকে কর্তৃত্বের সুরে বললেন : পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা
নিবারণের জন্য আইন আছে, সে-কথা কি তোর জানা নেই?
ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে দেখ, চামড়া ঠেলে

পাঁজরা বেরিয়ে এসেছে। ওটা অসুস্থ, ওর হালাল হবে।
এই ব'লে তিনি তো গেলেন। কিন্তু তিনদিন বাদে ফের হাজির।
দেখেন, রুস্‌কানেন্ তার হাড্ডিসার ঘোড়াটা নিয়ে
এক চিলতে খেতে কাজ করছে; যেন কিছুই হয়নি,
যেন দেশে আইন নেই, মুখিয়া নেই, অ্যাঁ!
রাগে গরগর করতে করতে
মুখিয়া ফিরে গেলেন; কড়া নির্দেশ দিয়ে
দুই বরকন্দাজকে বললেন : রুস্‌কানেনের ঘোড়াটাকে পাকড়া,
বেহাল জানোয়ারটাকে একখুনি তোল কশাইখানায়।
কিন্তু রুস্‌কানেনের ঘোড়াটাকে গলায় দড়ি দিয়ে
টানতে টানতে নিয়ে যাবার সময় বরকন্দাজেরা
চারদিক তাকিয়ে দেখলো, আরও আরও চাষীরা সব
বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে; কী এক অবিচল প্রতিজ্ঞায়
অনুসরণ করছে ঘোড়াটাকে। অবশেষে গাঁয়ের প্রান্তে এসে
থমকে দাঁড়ালো কিংকর্তব্যবিমূঢ় দুই বরকন্দাজ।
তখন নিস্‌কানেন্ ব'লে ধর্মভীরু এক চাষী—
রুস্‌কানেনের বন্ধু—এক প্রস্তাব রাখলো :
তামাম গাঁঘর থেকে ঘোড়াটার জন্য কিছুমিছু ক'রে
খাবার যোগাড় করা হবে; তাহলে আর ওটাকে
কশাইখানায় পাঠানোর দরকার হবে না। অনন্তর দুই বরকন্দাজ
ফিরে গেলো তাদের পশুঅন্তপ্রাণ মুখিয়ার কাছে।
পেশ করলো ঘোড়া নয়, স্বয়ং নিস্‌কানেন্‌কেই, এবং
রুস্‌কানেনের ঘোড়ার প্রতি তার সানন্দ সমাচার।

সে বললো : শুনুন, হুজুর মা বাপ,
ঘোড়াটা রুগ্ন নয়, কেবল তার জাবনার অভাব, ঘোড়া বিনে
রুস্‌কানেন্ অনাহারে মরবে। ঘোড়াটাকে জবাই করলে
রুস্‌কানেন্‌কেও আপনাকে শিগগিরই জবাই করতে হবে, মা বাপ।
এ কীধরণের কথা হ'লো? বললেন মুখিয়া : ঘোড়াটা
বেতবিয়ৎ, আর আইন হ'ল আইন; কাজেই তাকে জবাই করা হবে।
ফাঁপরে পড়লো দুই বরকন্দাজ; তারা আবার নিস্‌কানেন্‌কে নিয়ে
ফিরে এলো, আর আস্তাবল থেকে
রুস্‌কানেনের ঘোড়াটাকে নিয়ে চললো কশাইখানার দিকে; কিন্তু
গাঁয়ের শেষ মাথায় এসে দেখে

পঞ্চাশটি শৈলশীলার মতো পঞ্চাশজন কৃষক ; পেয়াদাদের ওপর
তাদের অবাক নিবন্ধ দৃষ্টি। বরকন্দাজ দু'জন তখন
ঘোড়াটাকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ প্রস্থান করে
এবং আরও অকম্প্র নিভালার কৃষকেরা
রুস্কানেনের ঘোড়াটাকে আস্তাবলে ফিরিয়ে আনে।
এ তো রাজদ্রোহ! মুখিয়া তড়পায়
একদিন বাদে আউলু থেকে ট্রেনযোগে
একডজন রাইফেলধারী শান্ত্রী এসে নিভালায় ঢোকে।
এমন শষ্পশ্যাম এমন রমণীয় গ্রাম নিভালায় এসে ঢোকে
শুধু বোঝাতে যে আইন আইন। সেই অপরাহ্নে
কৃষকেরা বাইবেলের উদ্ধৃতিখচিত আস্তরখসা দেয়ালের
বরগায় লটকানো রাইফেল, যা ১৯১৮-র গৃহযুদ্ধ থেকেই
মরচেয় মজছিল এবং যা একসময় লাল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে
লড়বার জন্য
তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল, সেই রাইফেলগুলো নামিয়ে নেয়।
এখন তারা সেগুলো আউলু থেকে আগত শান্ত্রীদের দিকে
ঘুরিয়ে ধরে। একই সন্ধেয় বিভিন্ন দিশপাশের গ্রাম থেকে
শ'তিনেক কৃষক পাহাড়ের ওপর চার্চের অদূরে
মুখিয়ার মঞ্জিল অবরোধ করে। মুখিয়া তখন
দোটানা-পোড়েনে প'ড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে
শাদা হাত নাড়েন এবং অসামান্য বাগ্মিতায়
রুস্কানেনের ঘোড়ার প্রতি একটি ভাষণ ঝাড়েন
এবং তাকে জানে-না-মারার প্রতিশ্রুতি দেন ;
কিন্তু কৃষকেরা তখন রুস্কানেনের ঘোড়ার কথা পাড়ে না ;
তারা দাবি করে
বলপূর্বক নিলামের বিলোপ এবং যাবতীয় ধার্য করের প্রত্যাহার।
প্রাণভয়ে ভীত মুখিয়া তখন
দূরভাষের দিকে দৌড়োন, কারণ কৃষকেরা তখন
দেশে যে আইন ছিল এটাই যে ভুলেছে তাই নয়
মুখিয়ার মঞ্জিলে যে একটা টেলিফোনও আছে
সেটাও বেমালুম বিস্মৃত। তাই মুখিয়া এখন দূর
হেলসিঙ্কির উদ্দেশে
তাঁর দুর্দশার কথা জ্ঞাপন করতে থাকেন
এবং সেই রাত্রেই হেলসিঙ্কি অর্থাৎ রাজধানী থেকে আসে

সাতটা বাসে দুই শত মেশিনগানধারী সৈন্য
আর তাদের আগে আগে সশস্ত্র শকট
এবং এই সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে তারা
কৃষকদের পর্যুদস্ত ক'রে
গাঁয়ের বারোয়ারি মণ্ডপ পর্যন্ত পিটিয়ে নিয়ে যায়
নিভালার এজলাশে হেঁচড়ে হাজির করে তাদের মুখপাত্রদের
এবং দেড় বছরের মেয়াদে তাদের গারদে ঠাশার হুকুম হয়
যাতে নিভালার আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়
কিন্তু এত কাণ্ডের পর শেষতক
জনগণের অজস্র চিঠির ঝাপটায়
মন্ত্রীমহোদয়ের ব্যক্তিগত মধ্যস্থতায়
রুস্কানেনের ঘোড়াটা অব্যাহতি পায়।।

নীহাররঞ্জন বাগ

শয়তানের মুখোশ

দেয়ালে আমার এক জাপানি খেলনা ওই
চারদিকে সোনাখচা শয়তানের দানব মুখোশ।
গভীর করুণাভরে আমি দেখি ওর
কপালের স্ফুরিত ধমনী—
পাপে কী কঠিন শ্রম বেশ বোঝা যায়!

শঙ্খ ঘোষ

অশুভের মুখোশ

আমার দেয়ালে ঝুলছে একটা জাপানি কাঠের মুখ,
অশুভ কোন দানবের মুখোশ, সোনার জলে গিল্টি করা।
সহানুভূতির চোখে তাকিয়ে থাকি :
কপালের ফুলে-ওঠা শিরগুলি জানিয়ে দিচ্ছে
কী ভীষণ কষ্টকর অশুভ হওয়া।

সমীর দাশগুপ্ত

চাকা পাল্‌টানো

পথের ধারের পাড়ে উঠে ব'সে আছি।
ড্রাইভার একটা চাকা পাল্‌টাচ্ছে।
যেখান থেকে আমি আসছি সেটা আমার পছন্দ ছিল না।
যে জায়গায় যাচ্ছি, তাও আমার পছন্দ নয়।
লোকটি চাকা পাল্‌টাচ্ছে,
তার দিকে কেন আমি তাকিয়ে আছি
অধীর আগ্রহে?

বিষ্ণু দে

চাকা-বদল

বসে আছি রাস্তার কিনারে
ড্রাইভার বদ্‌লে নিচ্ছে গাড়ির চাকা
আমি যেখান থেকে এসেছি আমার মন তাতে খুশি নয়
যেখানে আমি চলেছি, মন সায় দেয় না তাতেও
কেন আমি কেন চাকা-বদল দেখছি
ধৈর্যহীন?

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নৌকো-বাওয়া, কথা-বলে-যাওয়া

এখন সন্ধে। সামনে দিয়ে অবলীলায় ভেসে চলেছে
ভাঁজ-করা-যায় এমন দুটো নৌকো। তাদের মধ্যে
উলঙ্গ দুই যুবাপুরুষ। পাশাপাশি নৌকো বেয়ে যেতে-যেতে
কথা বলছে তারা। কথা বলতে-বলতে
নৌকো বেয়ে চলেছে ওরা পাশাপাশি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দাঁড়ি মাঝির কথা

সন্ধ্যায় চলে দু'খানা নৌকো পাশাপাশি দাঁড় ফেলে
দুই নৌকোয় ন্যাংটো জোয়ান দুটো
খুব কাছাকাছি দাঁড় ফেলে আর কথা বলে
কথা বলে আর দাঁড় ফেলে খুব কাছাকাছি।

বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত

বাগানে জলসিঞ্চন বিষয়ে

আহা! বাগানে জলসিঞ্চন, সবুজকে উৎসাহিত করা!
তৃষ্ণার্ত গাছ-কে জলদান! দাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাও
আর ঝোপ-ঝাড়দেরও ভুলো না,
এমন কি যাদের ফল ধরে না কিংবা যারা
অবসন্ন, ক্ষীয়মান। আর দেখো যেন বাদ না পড়ে
ফুলের মধ্যে মধ্যে আগাছাগুলো—ওরাও
তৃষ্ণার্ত। সিঞ্চিত কোরো না
কেবলমাত্র ঘাসজমির তাজা অংশে অথবা শুধুমাত্র দগ্ধ দিকটায় ;
নাঙ্গা মাটিও চায় সযত্নে চাঙ্গা হতে।

বিষ্ণু দে

নির্বাসনের নিসর্গ

অথচ আমিও, শেষ নৌকাটির গায়ে,
দেখেছি উষার খুশি দড়িতে দড়িতে নাচে
আর ডলফিনের অনেক ধূসর শরীর
জাপান সমুদ্রে জেগে ওঠে।

খুদে ঘোড়াগাড়ি, সোনালি গিল্টি করা,
লুপ্তভাগ্য ম্যানিলার গলিপথে
লাল আস্তিনে ঢাকা মেয়েদের হাত—
পলাতক হর্ষে চেয়ে দেখে।

তেলকূপ আর লস্‌অ্যাঞ্জেলিসের তৃষিত বাগান,
সন্ধ্যায় ক্যালিফোর্ণিয়ার খাদ, আর ফলের বাজার—
নির্বিকার থাকতে দেয়নি এমন কি দুর্ভাগ্যের দূতকে।

সমীর দাশগুপ্ত

নির্বাসনের দৈর্ঘ্যসম্বন্ধীয় চিন্তা

১. দেয়ালে পেরেক ঠুকো না
জামাটা চেয়ারের ওপর ফেলে রাখো
ক'টা দিনের জন্যে আর কেন মাথা ঘামাও?
কাল তুমি ফিরে যাবে।

ছোট্ট চারাটা জল আর নাই পেলো
চারাটা লাগানোই বা কেন?
ওটা একটা সিঁড়ির সমান লম্বা হবার আগেই
তুমি খুশিমনে এ জায়গা ছেড়ে চ'লে যাবে।
পথচারী কেউ সামনে পড়লে চোখের ওপর টুপিটা টেনে নিও।
অজানা ব্যাকরণের পৃষ্ঠা উল্টে কী লাভ?
যে-সংবাদ তোমাকে ঘরের দিকে টানছে
অন্তরঙ্গ ভাষাতে সে-সংবাদ লেখা।

কড়িবরগা থেকে চটা উঠে আসছে
(বাধা দেবার চেষ্টাই কোরো না)
জবরদস্তির দেয়াল যাবে গুঁড়িয়ে
একদিন যা সীমান্তে ছিলো উদ্ধত খাড়া—
ন্যায়ের পথ রোধ ক'রে।

দেয়ালের পেরেকটা দ্যাখো, যে পেরেক তুমি গেঁথেছিলে।
তুমি কবে ফিরে যাবে ভাবছো?
তোমার হৃদয়ে তুমি কী বিশ্বাস করো শুনতে চাও?

দিনের পর দিন
তুমি মুক্তির জন্যে খেটে চলেছো
তোমার ঘরের মধ্যে বসে তুমি লিখে চলেছো
তুমি তোমার কাজ সম্বন্ধে সত্যিই কী ভাবো জানতে চাও?
উঠোনের কোণে ঐ ছোট্ট বাদামগাছটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো
যার জন্যে তুমি বালতি-ভরা জল রোজ টেনে নিয়ে যাও।

সমীর দাশগুপ্ত

পাথুরে জেলে

বিরাট-দেখতে জেলেটা আবার এসেছে। অকেজো তার
নৌকায় ব'সে সে জাল ফেলে চলে, প্রত্যুষে প্রথম বাতি
জ্বলার সময় থেকে সন্ধ্যার শেষেরটি নেভা পর্যন্ত।

গ্রামবাসীরা বাঁধের কাঁকর মাটিতে ব'সে ব'সে দেখে
হাসিমুখে। সে ধরতে চায় হেরিং, অথচ প্রতিবার উঠে আসে ক'টা
পাথর।

সবাই হাসে। পুরুষেরা উরুতে চাপড় মারে, স্ত্রীলোকেরা
তলপেট চেপে হাসে, শিশুরা লাফাতে থাকে দারুণ মজায়।

অথচ জেলেটা যখন ছোঁড়া জাল তুলে দেখে
অসংখ্য পাথর তাতে ভরা, সে তাদের লুকিয়ে রাখে না, বরং দীর্ঘ
তামাটে হাত দিয়ে সেগুলি শূন্যে তুলে ধ'রে
বরাত যাদের খারাপ তাদের দেখায়।

সমীর দাশগুপ্ত

শেষের কবিতা

কবরশিলায় উৎকীর্ণ থাক এই ক'টি শেষ কথা
(যদিও তা এক অনাদৃত ভগ্ন ফলকমাত্র) :

এই গ্রহ ভেঙে খান্‌খান্‌ হবে, ধ্বংস হবে একদিন
তাদেরই হাতে যাদের জন্ম দিয়েছে এই গ্রহই—

একসঙ্গে বাঁচার উপায় হিশেবে আমরা
ভেবে বের করেছিলাম বড়ো জোর ধনতন্ত্রকে ;
আর পদার্থবিজ্ঞানের বেলায় আমরা চিন্তা
করতে পেরেছি আরেকটু বেশিই :
একসঙ্গে মরার উপায়।

সমীর দাশগুপ্ত

শেষ দিককার ছ-টি থিয়েটারের কবিতা

নতুন আর পুরোনোর খোঁজে

যখন তুমি তোমার ভূমিকাটা পড়ো
হাতড়ে, খুঁজে খুঁজে, চমকে যাবার জন্যে উৎসুক
দেখতে চেষ্টা কোরো কী আছে নতুন আর কী-ই বা পুরোনো।

কারণ আমাদের যুগ
আর আমাদের ছেলেমেয়েদের যুগ মূলত লড়াইয়েরই যুগ
নতুন আর পুরোনোর মধ্যে লড়াই।
শিক্ষক এমন এক বোঝা ব'য়ে বেড়ান যেটা বড্ড-ভারি,
শিক্ষকের সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বোঝা লাঘব ক'রে দেয়
বুড়ি মজুরনির সহজ বুদ্ধি—
এবং সে কিন্তু নতুন
আর তাকে নতুনভাবেই দেখাতে হবে। আর পুরোনো হ'লো
যে-সব ইশতেহার তাদেরই কাজে লাগবে
সেগুলোকেই হাতে তুলে নিতে যুদ্ধের সময়ে মজুরদের, আতঙ্ক ; তাকে
দেখাতেই হবে পুরোনো হিশেবে। কিন্তু
যেমন লোকে বলে, চাঁদের কলা যখন বদল হয়
প্রথমার চাঁদ এক সময়ে বুকে জড়িয়ে নেয়
বুড়ি চাঁদটাকেই। সহজেই যারা ভয় পায়, তাদের দ্বিধা
ঘোষণা করে নতুন কালকেই। সবসময়
ঠিক ক'রে নিয়ো কাকে বলে 'এখন' আর কী-ই বা 'গতকাল'।
শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সংগ্রাম
নতুন আর পুরোনোর লড়াই
সব মানুষের মধ্যেই ঝড় তোলে।
শেখাবার জন্যে শিক্ষকের যে-সদিচ্ছা
সেটা তার ভাইয়ের চোখেই পড়ে না, কিন্তু অচেনা-কেউ
সেটা চট ক'রেই ধ'রে নিতে পারে।
নতুন আর পুরোনো ধাঁচগুলোর জন্যে
তোমার চরিত্রগুলোর সব আবেগ-অনুভূতি আর কাজকর্ম
খুঁটিয়ে দেখে নাও।
পশারিণী হিম্মতমাঈয়ের দাঁও মারবার সব আশা
তার ছেলেমেয়েদেরই মরণ ; অথচ যুদ্ধ সম্বন্ধে
বোবা মেয়েটির মরিয়া আক্ষোভ
নতুন যুগেরই পরিচয়। সঞ্জীবনী ঢাকটাকে যেভাবে সে
টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় ছাতে
সে এক প্রচণ্ড সহায়ক, তোমাকে যেন ভ'রে দেয়
গর্বে ; কিছু যে শেখে না
সেই পশারিণীর সব উদ্যম উৎসাহ চেষ্টা
তাকে দেখো সহানুভূতির সঙ্গে।

তোমার ভূমিকাগুলো পড়তে-পড়তে, ভেতরটাকে আবিষ্কার করতে-করতে
বিস্মিত হবার জন্যে উৎসুক
নূতনকে নিয়ে উল্লসিত হও আর পুরোনোর জন্যে হও লজ্জায় অধোবদন।

পর্দাগুলো

বড়ো পর্দাটার ওপর আঁকো আমার ভাই পিকাসো-র খিটখিটে
শান্তিকপোত। তার পেছনে
টান ক'রে রাখো তারটাকে আর ঝুলিয়ে দাও
চঞ্চল-হ'য়ে-ওঠা আমার হালকা আধোপর্দাগুলোকে
আড়াআড়ি ফেনিল ঢেউয়ের মতো
মজুরনি বিলি ক'রে দিচ্ছে ইশতেহারগুলো
আর গালিলেয়ো ফিরিয়ে নিচ্ছে নিজের কথা
দুজনেই উধাও হ'য়ে যায়
নাটকগুলো যখন বদলায়। সেই অনুযায়ী ঠিক ক'রে নিতে হবে
কোন্‌টা হবে মোটা কাপড়ের, কোন্‌টা মিহি রেশমের, না কি হবে
শাদা বা লাল চামড়ার—আর এই মতো বাকি-সব।
শুধু তাদের খুব-একটা অন্ধকারে রেখো না, কারণ তাদেরই ওপর
তোমাকে প্রক্ষেপ করতে হবে উৎসারিত ঘটনাগুলোর
অধ্যায়-নাম—টানাপোড়েন তৈরি করবার জন্যে খানিকটা আর
খানিকটা যাতে আন্দাজ ক'রে নেয়া যায় কী দেখানো হবে।
আর অনুগ্রহ ক'রে
আমার পর্দাটা বানিয়ো অর্ধেক-উঁচু, কখনোই মঞ্চ একেবারে
আড়াল ক'রে দিয়ো না
হেলান দিয়ে ব'সে, দর্শক যেন
খেয়াল ক'রে দ্যাখে তার জন্যেই কী-রকম উদ্ভাবনীনৈপুণ্যে
সমস্ত প্রস্তুতি চলেছে ; যেন দেখা যায়
টিনে-তৈরি এক চাঁদ দুলতে-দুলতে নেমে আসছে,
একটা কাঠের ফালি বসানো ছাত ব'য়ে-আনা হচ্ছে ;
তাকে যেন বেশি-বেশি সবকিছু দেখিয়ে ফেলো না,
তবে অন্তত একটা-কিছু দেখিয়ো। আর সে যেন দেখতে পায়
এ-কোনো ইন্দ্রজাল-টাল নয়, বরং
খাটুনি, বন্ধুরা, কাজ।

আলোকসম্পাত

ওহে বিদ্যুৎবিশারদ, মঞ্চে আমাদের জন্যে দয়া ক'রে একটু আলো দাও।
অর্ধেকটা যদি অন্ধকারেই ঢাকা থাকে তবে আমরা
নাট্যকারেরা আর অভিনেতারা
কেমন ক'রে আমাদের জগতের ছবি ফুটিয়ে তুলবো?
মিটমিটে আবছা আলো
ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের চাই দর্শকের
জাগর চোখ, এমনকী সব-দেখা বিনিদ্র চোখ
তাদের বরং স্বপ্ন দেখতে দাও আলোর মধ্যে।
মাঝে-মধ্যে যখন একটু-আধটু রাত
আমাদের দরকার হবে, সেটা বোঝানো যাবে
চাঁদ কিংবা লণ্ঠন দেখিয়ে, তেমনিভাবে আমাদের অভিনয়ই
স্পষ্ট ক'রে দিতে পারবে—যখন তা চাই—
দিনের এটা কোন সময়। এলিজাবেথীয়টি তার কবিতায়
আমাদের দেখিয়েছিলো
সন্ধেবেলার ঊষর প্রান্তর
কোনো বিদ্যুৎবিশারদই যার কোনো জুড়ি পাবে না কোথাও
কিংবা ঐ প্রান্তরটাও নয়। কাজেই আলো ক'রে তোলো
যা নিয়ে আমরা এত খাটছি, যাতে দর্শক
দেখতে পায় ফিনল্যাণ্ডের মাটিতে চাষী-মেয়ে এমনি ভঙ্গিতে ব'সে পড়ে
যেন এ-জমিটা তারই।

গান

গানগুলোকে অন্যসবকিছু থেকে আলাদা ক'রে নাও।
সংগীতের কোনো প্রতীকচিহ্নে, আলোর কোনো বদলে
কোনো অধ্যায়-নামে, ছবি দেখিয়ে এবার বুঝিয়ে দাও
সহযোগিনী কোনো কলা
এসে হাজির হচ্ছে মঞ্চে। অভিনেতারা বদলে যাচ্ছে
গায়কে। তাদের ভঙ্গিটা এখন নতুন
এখন যখন তারা দর্শকদের উদ্দেশে গান ধ'রে দিয়েছে,
এতক্ষণ তারা কুশীলব ছিলো নাটকের,
তবে এখন তারা
কোনো আড়াল বা ছদ্মবেশ না-রেখে নাট্যকারেরই দোসর।

নান্না কাইয়াস, মাথাটা গোলগাল, জমিদারের মেয়ে
একটা মুরগির মতো বাজারে-নিয়ে-আসা
গান ধ'রে দেয়
মালিকের বদ্‌লে যাবারই গান।
পাছার দুলুনি ছাড়া তাকে মোটেই বোঝাও যাবে না—
এ তো ব্যাবসারই কৌশল
তার গোপন অঙ্গকে বদ্‌লে দিয়েছে কোনো ক্ষতয়।
এও বোঝা যাবে না
ক্যান্টিনের মেয়েটির গান বিশাল পরাজয়েরই গান
যদি-না
নাট্যকারের রোষ
সেই মেয়েটির রোষের সঙ্গে জুড়ে যায়।
কিন্তু উটকো ইভান ভেসোভচিকভ, বোলশেভিক শ্রমিক,
গান করে
সেই শ্রেণীরই লৌহকঠিন সুরে যে-শ্রেণী অপরাজেয়।
আর দরদী ভ্লাসোভা, মা
জানান, তাঁর সেই বিশেষ সাবধানী গলায়, যে
যুক্তির জয়পতাকার রং লাল।

ভাইগেলের সব সরঞ্জাম

যেমনভাবে মকাই-চাষী তার জমি পরখ করার জন্যে বেছে নেয়,
সবচেয়ে ভারি বীজগুলো আর কবি বেছে নেয়
তার কবিতার জন্যে অভ্রান্ত সব কথা তেমনিভাবে সে
বেছে নেয় কী-কী সরঞ্জাম তবে রূপায়িত চরিত্রগুলোর সঙ্গে
মঞ্চে যাবে। দস্তার সেই চামচে
যেটা হিম্মতমাঈ তার
মোঙ্গোল কুর্তার গলবন্ধের ভাঁজে আটকে রাখে, মমতাময়ী
ভ্লাসোভার সেই অমূল্য পার্টিকার্ড আর সেই অন্য এস্পানিওল মায়ের
সেই মাছধরার জাল অথবা ব্রন্‌জের বাটিটা
যেটা ধূলিতে-গড়াগড়ি-যাওয়া আন্তিগোনের।
শ্রমিকরমণী যে ঝোলা ব'য়ে নিয়ে যায়
যার ভেতর থাকবে তার ছেলের ইশতেহারগুলো
তার সঙ্গে কট্টর ব্যাবসাদার রমণীর টাকার থলে গুলিয়ে ফেলা চলবে না।

তার ভাঁড়ারের প্রত্যেকটা জিনিশ
সযত্নে নিজের হাতে বেছে নেয়া; ফিতে আর বেলট
দস্তার কৌটোগুলো আর বারুদ-ভরা বটুয়া
নিজের হাতে বাছাই ক'রে নেয়া সেই মুরগি আর ছড়িটাও
যেটা শেষটায়
বুড়ি মুচড়ে নিয়ে যায় গুণটানা দড়ির মধ্যে দিয়ে।
বাস্ক মেয়ের রুটি-সেঁকার টেবিল আর
গ্রিক রমণীর পিঠে ফিতে দিয়ে বাঁধা লজ্জার সেই কাঠের ফালি
দু-দিকে দুটো ফোকর যাতে তার হাত দুটো বেরিয়ে আসতে পারে।
রুশী রমণীর চর্বির বোয়ম
পুলিশের হাতের থাবায় যেটা একরত্তি দেখায়;
সমস্ত বেছে নেয়া হয়েছে
কোনটা কোন যুগের, কী তার কৃত্য আর কেমন তার সৌন্দর্য
চেনবার চোখ দুটি দিয়ে।
রুটি সেঁকবার হাত, জাল বোনবার হাত
সূপকারের হাত
সব বাস্তবতারই
রসপণ্ডিতের হাত।

শিল্পে আন্তরিকতা বিষয়ে

রূপোর গয়না যে বানায় সেই লোকটার আন্তরিকতা
থিয়েটারের শিল্পে শুভাগমন করুক আর শুভাগম হোক
সেই লোকদের আন্তরিকতার
বন্ধ দরজার আড়ালে যারা একটা ইশতেহারের বয়ান কী হবে
তা নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু তার রুগির ওপর ঝুঁকে-পড়া
কোনো ডাক্তারের আন্তরিকতা
থিয়েটারের শিল্পের সঙ্গে আর তুলনীয় নয়—
আর থিয়েটারের শিল্প সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ক'রে দেয়
কোনো পুরোহিতের আন্তরিকতা—তা সে কোমলই হোক অথবা তিরিক্ষিই হোক।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

থিয়েটারের গান

'তিনপেনি অপেরা' থেকে তিনটি গান

১

আর-যে হাঙর, তার দাঁত আছে, এটা
ওই-তো রয়েছে স্পষ্ট, দ্যাখে তা সকলে—
আর শ্রীম্যাক্‌হীথ, তার ছুরি আছে, তবে
জানে না লুকোনো আছে কোথায় কৌশলে।

হাঙর যখন তার নৈশভোজে বসে
পাখনায় লেগে যায় রক্তের ছিটে,
ম্যাক্‌হীথের হাত কিন্তু দস্তানায় ঢাকা :
টু শব্দ করে না কেউ তার মারপিটে।

টেমস্-এর তীর ধ'রে ধপাশ-ধপাশ।
ঘাড়মুখ গুঁজে পড়ে লোকজন সব,
হেতু কিন্তু এ নয় যে কলেরা লেগেছে :
ম্যাকিই এসেছে ফিরে, ছড়ায় গুজব।

সুগন্ধি ঝলমলে নীল এক রবিবারে
কে যেন পটোল তুললো সমুদ্রের তীরে—
শট্‌কে পড়লো কে একজন চৌমোহনা ঘুরে—
লোকে বললো : ম্যাকি নাকি ছিলো সেই ভিড়ে।

ওই-যে লোপাট হ'ল শ্মুল মেইয়ের
প্রচুর নিখোঁজ ধনীদুলালের মতো—
ওদিকে ম্যাকের বাড়ে টাকাটা-শিকেটা,
দেখি, যোগাযোগ তুমি প্রমাণ করো তো!

আবিষ্কার হ'লো সেই-যে জেনি টাউলার
চিৎপাত প'ড়ে আছে—চাকু গোঁজা বুকে—
ম্যাক্‌হীথ খাচ্ছিলো দিব্যি বন্দরের হাওয়া—
সে যে তার কিছু জানে, চিহ্ন নেই মুখে।

সহিস আলফঁস গ্লিৎ-সে-ই বা কোথায়?
চোবানিই খেলো? না কি চাকু খেলো? গুলি?

এ ধাঁধার সদুত্তর কেউ নিশ্চয়ই জানে।
ম্যাকি?—তার মুখে কিন্তু নেই কোনো বুলি।

কে যে এক বুড়ো আর সাত কাচ্চাবাচ্চা
পুড়ে ছাই হয়েছিলো সেদিন সোহোতে—
কাপ্তান ম্যাকিও ছিলো ভিড়ের ভিতরে—
চুপ রইলো, কেউ কিছু পারলে না শুধোতে।

আর সেই মেয়ে—যার স্বামী নেই বেঁচে—
বয়েস কুড়িও নয় (সে নাকি কুমারী)
জেগে উঠলো একরাত্রে সতীচ্ছদ ছিঁড়ে—
কী দাম দিয়েছে ম্যাকি—শ্রীযুগাবতারই!

২

জাগো হে থুরথুরে বুড়ো বাপু ভগবান,
চালাও পিছনচাক্কু, আবগারি বামাল,
জোচ্চুরি কি ফেরেব্বাজি চালাও সমান,
বাপ জিহোভাই দেবে সমস্ত সামাল!

ভাই দে বন্ধক, ওরে উল্লুকের ছানা,
বউকে নিলেমে চড়া, লুচ্চার সম্রাট,
মনে ভেবেছিস বুঝি ভগবান কানা?
শেষের সে-দিনে সব টেঁশে যাবে ঠাট!

৩

পীচাম : আমি কিন্তু বেশ
ভালোবাসি রাত্রিকালে বাড়ি ও বিছানা—
গিন্নি চান ফুর্তি। প্রভু তাঁকে কি জম্পেশ
জোগান সরেশ যত মিছরির পানা?

শ্রীমতী পীচাম : সোহো-র উপরে চাঁদ এ-রকমই ঠিক,
'শুনছো বুকের শব্দ' বাক্যি ইন্দ্রজাল—
এ যেমন 'তব সঙ্গে সর্বত্রই যাবো'—
চাঁদনি ছড়িয়ে দেয় রাত্রি আজকাল।

পীচাম : আমি কিন্তু বেশ
সে-কর্মই ভালোবাসি অর্থ যার হয়,
তারা তো জম্পেশ
ফূর্তি চায় : শেষকালে বেঘোরে ফুরোয়।

উভয়ে : কাজেই তাদের চাঁদ সোহো-তে কোথায়?
'শুনেছো বুকের শব্দ' বুলির হ'ল কী?
কী হ'ল 'তোমার সঙ্গে যাবোই যাবো'র?
চাঁদ-ফাঁদ বুড়ি ভেলকি ; শেষে তো নরকই!

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'তিন পয়সার পালা'র গান

১

চেষ্টা করলে হাঙ্গরেরও দাঁত দেখতে পাবে
কিন্তু যখন মহীনবাবুর ছুরিটা চমকাবে
তখন দেখতে পাবে না পাবে না।

হাঙ্গরেরা ধরলে শিকার কড়মড়িয়ে খায়
মহীনবাবুর কারবারটার শব্দ কি কেউ পায়?
কেউ শুনতে পাবে না পাবে না।

দিনদুপুরে পথে ঘাটে পড়ে মানুষের লাশ
খুনীর নাম কেই বা করে বাস্‌রে ওরে বাস্‌
কেউ নাম তো করে না করে না।

এই তো সেদিন থানার কাছে মরল দুটো লোক
দেখলো সবাই দারোগাবাবু করলো বিষম শোক
কারো বাক্যি সরে না সরে না।

ঘোষসাহেবের বসুমশায়ের ছেলে নিরুদ্দেশ
টাকা দিলে ছাড়া পাবে এই আছে আদেশ
কার আদেশ জানেন না জানেন না।

বদ্দিপাড়ার মতিবাবু চিৎপাত ফুটপাথে
বুকে সমূল ছুরি বিঁধে আছে যে তাঁর সাথে
ছুরি কার তা জানেন না জানেন না।

রহিম কোচোয়ানের ছেলে কাঁদছে দুমাস ধ'রে
গলায় নখের দাগ নিয়ে তার বাপটা গেল ম'রে
আর তো ফিরে পাবে না পাবে না।।

গত মাসে একটা মেয়ের সতীত্ব নাশ ক'রে
লোকটা শুনি স্বচ্ছন্দেই হেঁটে চলে ফেরে
কেউ তো ধরিয়ে দেবে না দেবে না।।

২

মোহিনীমোহন দেব
আর মোহিনীবালা দেবী
পুরুত মশাই মন্ত্র পড়ান অং বং চং কং।
আমরা বলি হ'ল কী সে?
যদুর মামা? মধুর পিসে?
শুনে তারা বল্লে হেসে বিবাহং বিবাহং!

বচ্ছরটাক পরে
গেলাম তাদের ঘরে
শুনি দুজনেই জোর গলা ফাটাচ্ছে অং বং চং কং।।
আমরা বলি হ'ল কী সে?
মধুর মামা? যদুর পিসে?
শুনে তারা বল্লে শেষে কলহং কলহং!

রূপান্তর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহীন্দ্র ।। এই ফাঁকেতে ভদ্দর বাবু শুনুন দিয়ে মন
আপনাদেরই সামনে কিছু আছে নিবেদন।

পাপীতাপী ঢের লোকই যে নেই তাতে সন্দেহ
কিন্তু তাদের ভাত জোটে না জানেন কি তা কেহ?
ভর পেটটাকে খাইয়ে দিয়ে তবে দেবেন জ্ঞান
জ্ঞানে দেখুন কাজ হয় না লাগেই পুলিশ ভ্যান।
শরীরটাতো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ।

নেপথ্যে ।। মানুষ তবে বাঁচে কিসে?

মহীন্দ্র ।। মানুষ তবু বাঁচে কিসে শুনুন বাবু বলি,
লোক ঠকিয়ে লোক পিটিয়ে কেঁদে ককিয়ে
চুরিচামারি করেই বাবু ভরে সবাই থলি
মানুষ জাতি নিজের জ্ঞাতি এই কথাটাই ভুলি।

নেপথ্যে ।। অতএব মহাশয় শুনুন দিয়ে মন

সকলে ।। বাঁচে যারা পাপী তারা
প্রমাণ করুন—নন।

জ্যোৎস্না ।। যখন বাবু বলেন আমরা খারাপ মেয়েছেলে
ভদ্দর মেয়ে ভালো মেয়ে যখন আমরা নই
তখন শুনুন একটা কথা পষ্ট করে কই
ভদ্দর মশাই থাকে না কেউ পেট ভ'রে না খেলে
দেরি হয়ে গেছে বাবু তবু লিখুন খাতায়
ভাত চাট্টি খেতেই হয় যখন বসি পাতায়
শরীরটা তো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ।

নেপথ্যে ।। মানুষ তবে বাঁচে কিসে?

জ্যোৎস্না ।। মানুষ তবে বাঁচে কিসে শুনুন বাবু বলি,
লোক ঠকিয়ে লোক পিটিয়ে কেঁদে ককিয়ে
চুরিচামারি করেই বাবু ভরে সবাই থলি
মানুষ জাতি নিজের জ্ঞাতি এই কথাটাই ভুলি।

নেপথ্যে ।। অতএব মহাশয় শুনুন দিয়ে মন

একত্রে ।। বাঁচে যারা পাপী তারা
প্রমাণ করুন—নন্।

রূপান্তর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পোস্টার : পিতামাতা সাবধান

যতীন ।। আমার মতে পেটপুরে খাও,
পেট পুরে খাও ;
ভালো করে ঘুম দাওরে বাবা,
ভালো করে ঘুম দাও,
তা না
'প্রেম করিসি, বিয়ে করবঅ'
পেট গরমের ধাত,
জাত মানে না, জ্ঞাত মানে না
বিয়ের কথায় কাৎ ;
গুণ্ডাষণ্ডা যাকে পেল তার
হাত ধরে উধাও!

মালতী ।। "আকাশে চাঁদ উইঠেসে"।
এখন "আমি-তুমি তুমি-আমির" খেলা
নিজে নিজে খেললে বাবা
করলে যা চায় মনটা!
বাপ-মা খরচ করে মোলো
বদলে পেল ঘণ্টা!

দুজনে।। বয়েসকালের ধম্ম বাবা
তোমাদের দোষ কী?
মা-বাপের সঙ্গে শেষে
করবে আপোষ কি?
নয়তো যা-খুশি তাই করো সোনা,
আমাদের তো বাঁচাও
এখন সে তোমাকে নাচাক জাদু
তুমি তাকে নাচাও!

পোস্টার : মেয়েছেলের কারণে সর্বনাশ

পৃথিবীর সেরা পালোয়ান যত দেখেছি,
কী ভীষণ তেজ, কী তার শক্তি দেখেছি,
সে যেন হাঙ্গর, দুনিয়াটা তার সমুদ্দুর,
ছোট বড় তার কিছুতে নেইকো ভক্তি।
কে তাকে ডোবায়? মেয়েমানুষ।
কতো জ্ঞানী দেখি, কত বিদ্বান,
রাজনীতিবিদ কতো
কতো না লড়ছে সমাজ সমাজ
আছে নীতিজ্ঞান কতো।
সারাদিন ধরে জ্ঞান দিয়ে ফেরে
রাত্তিরে সে তো ভিন্ন
কে তাকে ডোবায়? মেয়েমানুষ।
এই তো দেখুন ফাঁসি হবে বলে দাঁড়িয়ে
লোকটা তো যাবে দুনিয়ার মায়া ছাড়িয়ে
সামনে মরণ বাড়িয়ে চরণ থমকে
তারো রক্ত তো উছলিয়ে ওঠে গমকে
কারণ কি তার? মেয়েমানুষ।
মেয়ে সে দেখেছে মেয়ে সে পেয়েছে অগুনতি
তবু আরো চাই এ নেশার এই নিয়তি
সারাদিন ধরে বুদ্ধিতে ফেরে
রাত্তিরে সে তো ভিন্ন
কে তাকে ডোবায়? মেয়েমানুষ।

ভিক্ষুকদের গান

একদা মনেতে ভাবনা আছিল
বুদ্ধিতে পার পাব
এ বৃহৎ আশা আছিল মাইরি যৌবনে
এখন দশম দশাতে দেখিনু
সকলই বুদ্ধি ফাঁকি
পেট চনচন দারুণ খিদেতে
বুদ্ধি কি ধুয়ে খাবো?

দেখেশুনে বলি : ধ্যূর শালা
কলিকার ধোঁয়া যেমন পাকায়
তেমনি করিয়া উচ্চমার্গে শেষে
এ ভাবে বাঁচার হয়ে যাক ফয়সালা
(সমস্বরে "হরিবোল")
দেখেছিনু দেশে একালেতে শেষে
ভালো লোকই হরিদাস
তাই মনে লেগেছিল সন্দ
সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরেছিনু
বাঁকা পথে ভাই আমাদের হাঁটা
সে এক বিষম দায়
এগোবার পথ যেদিকে তাকাই
সকল দিকেতে বন্ধ
আরে তাই তো বলিরে ; ধ্যূর শালা
কলিকার ধোঁওয়া যেমন পাকায়
তেমনি করিয়া উচ্চমার্গে শেষে
তোমার বুদ্ধি হয়ে গেছে ফয়সালা।
(সমস্বরে) 'হরিবোল'
'বল হরি'
'হরিবোল'
'দারোগাসায়েবকে'
'খাটেতোল!'

('তিন পয়সার পালা' থেকে)
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারী কামানের গান

জন ছিল এক সৈনিক, আর জেমস্‌ও তো ছিল তাই।
জর্জ হয়েছিল সার্জেণ্ট দিন কতো।
সৈন্যদলের কিন্তু এসব নামধামে কাজ নাই।
যেতে হল দূর যুদ্ধ সীমায় কুচ করে অবিরত।

সৈনিকদের জীবনধারণ
ভারী কামানের খুশির কারণ ;
দক্ষিণে দূর কুমারিকা থেকে উত্তরে কুচবিহার
কোনো রাতে হলে বৃষ্টি
কারো যদি কাড়ে দৃষ্টি—
ভীত বা হিংস্র চেহারা
ভিনদেশী কোনো বেচারা,
তারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো কোর্মা পাকাবে তার।

জন শীতে কাবু হল এক রাতে,
জেমস পেল মদে খাসা আরাম।
হেঁকে বলে জর্জ—ওহি ঠিক বাত,
তব্ সেপাইকে খানা হারাম।
সৈনিকদের জীবনধারণ
ভারী কামানের খুশির কারণ ;
দক্ষিণে দূর কুমারিকা থেকে উত্তরে কুচবিহার
কোনো রাতে হলে বৃষ্টি
কারো যদি কাড়ে দৃষ্টি—
ভীত বা হিংস্র চেহারা,
ভিনদেশী কোনো বেচারা,

তারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো কোর্মা পাকাবে তার।
জন চলে গেছে পশ্চিমে জেমস মরে গেছে কতোকাল।
জর্জ বেপাত্তা কোথায় মাথার দোষে।
তো সে যাই হোক, রক্ত এখনো রক্তেরই মতো লাল।
নতুন নতুন সৈন্য আবার ভর্তি করছে কষে।
সৈনিকদের জীবনধারণ
ভারী কামানের খুশির কারণ ;
দক্ষিণে দূর কুমারিকা থেকে উত্তরে কুচবিহার
কোনো বাতে হলে বৃষ্টি
কারো যদি কাড়ে দৃষ্টি—
ভীত বা হিংস্র চেহারা,
ভিনদেশী কোনো বেচারা,
তারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো কোর্মা পাকাবে তার।

('তিন-পেনি অপেরা' থেকে)
মণীন্দ্র রায়

ভারী কামানের গান

জন ছিল গোরা ফৌজি, জেমস-ও ছিল তাই,
আর জর্জ উঠেছিল সার্জেন্ট পদবীতে ;
নাম-ধাম থাক, ফৌজ বলতে ফৌজ-ই,
শীগ্‌গীরই ওরা পাড়ি দেবে সেই উত্তরে, চৌকিতে।

ফৌজিরা কিসে বাঁচে
ভারী কামানের আঁচে
কমোরিন থেকে বেবাক কোচবেহার।
যদি কোনো রাতে হয় বৃষ্টি
আর চোখে পড়ে অনাসৃষ্টি
ফ্যাকাসে বা কালো মুখ
বিজাতীয় যতো লোক
অমনি তাদের বানানো যে যায় কাবাব চমৎকার।

জন ভোগে রাতে ঠাণ্ডায়
আর, জেমসের কাছে হুইস্কি "নেহাৎ কড়া জী,"
জর্জের কথা এক, "সব কুছ ঠিক হ্যায়,"
ফৌজ বাছবে মাল শুঁড়িখানায় কি?

জন চ'লে গেল পশ্চিমে, আর জেমস-ও পড়ল মারা,
জর্জ-ও হ'ল বেপাত্তা, একদম,
রক্ত তবুও থাকেই গরম লাল, রক্তপারা,
কর্তারা দেয় ফৌজে আবার ভর্তিরই হুকুম।

(ওরা ব'সে ব'সে পা নাচায়, কুচকাওয়াজের ঢঙে।)

ফৌজিরা কিসে বাঁচে
ভারী কামানের আঁচে
কমোরিন থেকে বেবাক কোচবেহার।
যদি কোনো রাতে হয় বৃষ্টি
আর চোখে পড়ে অনাসৃষ্টি

ফ্যাকাসে বা কালো মুখ
বিজাতীয় যতো লোক
অমনি তাদের বানানো যে যায় কাবাব চমৎকার।।

('তিন-পেনি অপেরা' থেকে)
সিদ্ধেশ্বর সেন

জলদস্যু জেনি

বাবুরা, আজ আমাকে দেখছেন গেলাশগুলি ধুয়ে ধুয়ে রাখছি
আর আপনাদের সকলের জন্য বিছানা তৈরি করছি।
দু-চার পয়সা বখশিশ, তাতেই খদ্দেরকে ধন্যবাদ
আমাকে দেখছেন ছেঁড়া কাপড়ে, এই নোংরা হোটেলটায়
অথচ আপনারা আদৌ জানেন না কার সঙ্গে আজ কথা বলছেন।
কিন্তু কোন এক সন্ধ্যায় এই বন্দরে উঠবে মহা সোরগোল
সবাই জিগেশ করবে : কিসের আওয়াজ হতে পারে?
শুধু দেখবে আমি হো হো ক'রে হাসছি আর গেলাশগুলি ধুয়ে ধুয়ে রাখছি
সবাই বলবে : ওর হাসিটা যেন কেমন।
আর তখন দেখা যাবে এক জাহাজ, আটটি পাল
আর পঞ্চাশটা তার কামান—
তীরে এসে ভিড়ছে।

তারা বলবে, যাও লক্ষ্মী মেয়ে, গেলাশগুলি ধুয়ে ফেল দেখি,
আমার হাতে কয়েকটা পয়সা দেবে গুঁজে
আমিও তাদের গুঁজে রাখব বুকে;
বিছানার চাদরগুলি টান টান ক'রে টেনে দেব
কিন্তু আপনারা কেউ সেই রাত্রে তার উপরে শোবেন না।
এখনো আপনারা ভাবতেই পারছেন না আমি কে
কিন্তু কোন সন্ধ্যায় এই বন্দরে এক বিস্ফোরণ হবে
ওরা জিগেশ করবে : কিসের ঐ বিশ্রী আওয়াজ?
শুধু আমাকে দেখতে পাবে জানালার সামনে দাঁড়ানো
ওরা বলবে : মেয়েটার হাসি কিন্তু মোটেই ভালো ঠেকছে না—

আর ঠিক তখন সেই জাহাজ, আটখানি পাল যার
আর কামান পঞ্চাশখানা—
এই শহরের উপর গোলা ছুঁড়ে মারবে।

বুঝেছেন বাবুরা, তখন আপনাদের হাসি ঠিকই যাবে মিলিয়ে
কারণ দেয়ালগুলি ধ্বসে পড়বে মুহূর্তে
আর শহরখানাও গুঁড়িয়ে সমতল হবে ধুলায়।
শুধুমাত্র একটা নোংরা হোটেল থেকে যাবে, কারণ তা হতেই হবে।
ওরা জিগেশ করবে : এই হোটেলটাই কেন পার পাবে শুধু?
আমাকে দেখতে পাবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি সকালের দিকে
সবাই ব'লে উঠবে : আরে ঐ মেয়েটাই থাকত এখানে?
আর তখন সেই জাহাজ, আটখানা যার পাল
আর কামান পঞ্চাশখানা—
মাস্তুলের মাথায় তার উড়িয়ে দেবে নিশান।
তারপর দুপুরের দিকে একশ জন লোক নেমে আসবে তীরে
ছায়া-গড়ানো জলের ধার দিয়ে হেঁটে আসবে
দ্রুত হাতে টেনে টেনে জড়ো করবে রাস্তার সবকটা লোককে
তাদের সবাইকে বেড়ি লাগিয়ে ফেলে দেবে আমার পায়ে
আর আমাকে বলবে : কোনগুলিকে সাবাড় করতে হবে?
সেই মধ্যাহ্নে সমস্ত বন্দর নিঃশব্দ হয়ে যাবে
যখন তারা আবার বলবে : বলুন, কোনটা খতম হবে এখন?
তখন আপনারা শুনবেন আমি চিৎকার ক'রে বলব : সব কটাকে!
আর প্রত্যেকটি মাথা গড়িয়ে পড়ার সময় আমি চেঁচিয়ে উঠব : চমৎকার!
তারপর সেই জাহাজ, আটখানা পাল যার
আর পঞ্চাশটা কামান—
সে তখন মিলিয়ে যাবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

('তিন-পেনি অপেরা' থেকে)
সমীর দাশগুপ্ত

জেনির গান

মহাশয়গণ, মা একবার মুখের উপরে
শাপান্ত করেন আমায়,
বলেন, তোর পরিণতি সেই লাশকাটা ঘরে
কিংবা আরও কুৎসিত কোনো জায়গায়।
মুখের কথা সহজ ব'লে
ওতে কান দিইনি আমি
কথায় কাত হবার পাত্রী আমি নই,
সময় আসুক, দেখবে কী হই আমি,
মানুষ তো আর পশু নয়!
শয্যা পাতো যেমন, শুতে হয় তেমন,
এ তো হক কথা,
কিন্তু পা ফেলতে হয় ফেলব আমি,
মাড়িয়ে দিয়ে যাবে, সে তো তোমাদের।

মহাশয়গণ, বন্ধু একটি ছিল একদা,
বলতো সে সর্বদা
'পীরিতির বড়ো কিছু নেই পৃথিবীতে',
আর, 'শুধু অদ্যকার কথা ভাবা যাক।'
ওহো সখা, কথাটা বলা সহজ বটে,
কিন্তু যৌবন ব'য়ে যায়
তখন বিছানাই জীবনের সবটা নয়।

হাতে সময় কম, কাজে লাগানো চাই সময়কে,
মানুষ তো আর পশু নয়!
শয্যা পাতো যেমন, শুতে হয় তেমন,
এ তো হক কথা
কিন্তু পা ফেলতে হয় ফেলব আমি,
মাড়িয়ে দিয়ে যাবে, সে তো তোমাদের।

('মাহাগোনি নগরের উত্থান ও পতন' থেকে)

সমর সেন

'মা' নাটক থেকে

(যাই করো না কেন)

কাপড় কাচো
দুবার কাচো
যতই কাচো
ধবধবে ছেঁড়া কাঁথা
জোড়া লাগে না।
হেঁশেল ঠেলো
যত্ন ক'রে, কষ্ট ক'রে,
পয়সায় টান পড়লে কিন্তু
ঝোলটা শুধু জল।
কাজ ক'রে যাও আরো আরো,
পয়সা বাঁচাও, ত্যাগ করো,
হিশেব করো পাইপয়সা খরচ!
পয়সায় টান পড়লে কিন্তু,
সংসার অচল।

যাই করো না কেন, কিছুই যথেষ্ট নয়,
দীন সংসার তোমার আরো দীন হবে,
এভাবে আর চলতে পারে না দিন,
কিন্তু পথটা কী বলতে পারো?
গাছের নির্বোধ পাখির দল
শীতের তুষার ঝড়ে শাবকদের খাওয়াতে না পেরে
করে ব্যর্থ কাকলী।
তুমিও তাই করছো—

যাই করো না কেন...
ব্যর্থ মেহনত তোমার, পণ্ড এই শ্রম,
স্থিতিহীনকে পুনঃস্থাপন, অপ্রাপ্যকে পাওয়া।
পয়সায় টান পড়লে শ্রম ব্যর্থ হতে বাধ্য।
রাঁধতে গিয়ে যখন দেখ মাছমাংসের অভাব,
সে অভাবের ফয়সলা কিন্তু রান্নাঘরে হয় না।

যাই করো না কেন...
কিন্তু পথটা কী বলতে পারো?

উৎপল দত্ত

(মায়ের কাছে বিপ্লবী শ্রমিকদের গান)

সাফ করে যাও জামাকাপড়
সাফ করে যাও, শেষে
দম ফুরোলে দেখতে পাবে
সব গিয়েছে ফেঁসে।

রাঁধো বাড়ো খাও, হাঁড়িতে
যা পারো সব দাও
টান পড়লে টাকাকড়িতে
ঝোল হয়ে যায় জল।

যেমন পারো খেটেপিটে
হিসেব করো, জমাও।
টান পড়লে টাকাকড়িতে
সবকিছু অচল।

যাই করো না
যথেষ্ট না
চলে না সংসার
দিনে দিনেই বাড়তে থাকে ভার,
এভাবে আর নয়, তো তোমার
কী আছে করবার?

তুষারঝড়ে পাখি যেমন
হতাশ অসহায়
শিশুর খাবার খুঁজে দেবার
দিকদিশা না পায়
পায় শুধু পথ দুঃখ পাবার তেমনি তোমার হায়-হাহাকার
জমছে হতাশায়।

যাই করো না
যথেষ্ট না
চলে না সংসার
দিনে দিনেই বাড়তে থাকে ভার।
এভাবে আর নয়, তো তোমার
কী আছে করবার?

সব মেহনত পণ্ড তোমার
জোড়াতালির খেলা—
পাবার যা নয়, এইভাবে যায় পাওয়া?
টান পড়লে টাকাকড়িতে যথেষ্ট না এসব রীতি।
হেঁসেলভরা মাংস যে নেই, তার
হেঁসেল ঠেলে হয় না প্রতিকার।

যাই করো না
যথেষ্ট না
চলে না সংসার
দিনে দিনেই বাড়তে থাকে ভার।
এভাবে আর নয়, তো তোমার
কী আছে করবার?

শঙ্খ ঘোষ

(কিংকর্তব্যের গান)

সামনে তোমার শূন্য থালা, বেশ,
কেমন করে খাবে?
তোমার ওপর ভার, এ গোটা দেশ
ওলটাবে পালটাবে,
যতক্ষণ না থালা-থালা খাবার
নিজের মতো পাবে।

কাজ নেই তাই বেকার তুমি, বেশ,
কেমন করে খাবে?

তোমার ওপর ভার, এ গোটা দেশ
ওলটাবে পালটাবে,
যতক্ষণ না সমস্ত কাজ পাবার
সব অধিকার তোমার মুঠোয় যাবে।

হাসুক ওরা বলুক শক্তিহীন—
সময় নষ্ট কোরো না আর, কাজ।
কী করবে সেই ভাবনা করো আজ
দেখো সবাই চলছে কি না ঠিক।
আসছে তোমার কথা বলার দিন
হাসবে অনেক সেদিন শক্তিহীন।

শঙ্খ ঘোষ

(কীভাবে কী হবে?)

এক বাটি ডালও যদি তোমার জন্যে নেই
কেমন ক'রে খাওয়া হবে তবে?
রাষ্ট্রটাকে উল্টে দাও
মাথার উপর দাঁড় করিয়ে রাখো
যতক্ষণ না পাও প্রয়োজনের খাবার,
যতক্ষণ না তুমি হও তোমারই অতিথি।

কাজকর্ম, কিছুই যদি না পাও
কেমন ক'রে পেট চলবে তবে?
রাষ্ট্রটাকে উল্টে দাও
মাথার উপর দাঁড় করিয়ে রাখো
যতক্ষণ না সব কারখানা কল
কাজকর্ম তোমার মুঠোয় আসে।

রোগাপটকা-তোমায় দেখে ওরা যদি হাসে
কেমন ক'রে এগিয়ে যাবে তবে?

আর যত লোক রোগাপটকা পাবে
তাদের ঠেলে ঢোকাও মিছিল-জাঠায়
যতক্ষণ না তুমিও হবে দারুণ শক্তিমান।
ওদের মুখে হাসিও মিলিয়ে যাবে।

সমীর দাশগুপ্ত

(ছেঁড়া জামার গান)

যখন ছেঁড়ে জামা
তোমরা ছুটে এসে বলো, চলবে না আর, না না
সবাই মিলে চাই প্রতিকার, হাত লাগানো চাই
হুড়মুড়িয়ে ছুটতে থাকো খোদ মালিকের কাছে।
আমরা মরি শীতে
তোমরা ফেরো বুক ফুলিয়ে
দুহাত মেলে দেখাও কেমন জিৎ
জোড়াতালির বাহার।
বাহা! তাপ্পি হলো বেশ—
কিন্তু বলো কোথায় গেল
আস্ত জামা?

খিদেয় করি হা হা
তোমরা ছুটে এসে বলো, চলবে না আর, না না
সবাই মিলে চাই প্রতিকার, হাত লাগানো চাই
হুড়মুড়িয়ে ছুটতে থাকো খোদ মালিকের কাছে।
আমরা মরি খিদেয়
তোমরা ফেরো বুক ফুলিয়ে
দুহাত মেলে দেখাও কেমন জিৎ
টুকরো রুটির আহার।
বাহা! টুকরো হলো বেশ—
কিন্তু বলো কোথায় গেল
আস্ত রুটি?

তাপ্পিতে না, চাই আমাদের
আস্ত জামা
টুকরোকে নয়, চাই আমাদের
আস্ত রুটি
এক টুকরো কাজ শুধু নয়, চাই আমাদের
সমস্ত কারখানা
কয়লা এবং লোহার খনি
গোটা এ দেশ
সব আমাদের চাই
তার বদলে বাপু
কী আমাদের দিচ্ছ হে তোমরা?

শঙ্খ ঘোষ

(জোড়াতালির গান)

প্রতিবারই
যখনই হয়েছে শতছিন্ন আমাদের পরনের জামা
তোমরা এসেছ সাততাড়াতাড়ি, বলেছ,
এ জামায় আর চলে না,
সবাই মিলে সর্বতোভাবে করতে হবে প্রতিকার—
ছুটেছ লালায়িত প্রত্যাশায় মালিক-সকাশে,
এদিকে আমাদের শীতকম্পিত প্রতীক্ষা।
তারপর
ফিবে এসেছ বিজয়দৃপ্ত হাস্যে
ভিক্ষালব্ধ একফালি ন্যাকড়া হাতে,
বলেছ জামায় তালি মেরে নাও।
বেশ, মারলাম জোড়াতালি,
কিন্তু বলো দেখি,
আস্ত জামাটা কবে পাব?
প্রতিবারই
যখনই ক্ষুধায় করেছি আর্তনাদ,
তোমরা এসেছ সাততাড়াতাড়ি, বলেছ,

এভাবে দিন চলে না,
সবাই মিলে সর্ব উপায়ে করতে হবে প্রতিকার—
ছুটেছ লালায়িত প্রত্যাশায় মালিক-সকাশে,
এদিকে আমাদের ক্ষুধাজর্জর প্রতীক্ষা।
তারপর
এসেছ ফিরে বিজয়দৃপ্ত হাস্যে
এক মুঠো ভিক্ষার অন্ন হাতে,
বলেছ, এই দিয়ে চালিয়ে নাও।
বেশ নিলাম চালিয়ে,
কিন্তু বলো দেখি,
চালের আড়ৎটা পাব কবে?
জোড়াতালিতে আর চলবে না,
চাই আস্ত জামা।
মুষ্টিভিক্ষা আর চলবে না,
চাই আড়ৎ, ধানের গোলা।
বস্তির ঘরে আর চলবে না,
চাই পুরো কারখানা।
চাই কয়লা,
যত ধাতুর খনি আছে দেশে সব চাই,
চাই রাষ্ট্রক্ষমতা।
শুনলেন দাবিদাওয়া?
সেখানে আপনারা কী দিচ্ছেন—?

উৎপল দত্ত

(লেখাপড়ার গুণকীর্তন)

গোড়ার থেকে পড়ো
দল চালাতে হবে তোমায়, পড়ো
দেরি হয়নি, পড়ো
পড়ো বাপু অ আ ক খ, এটুকু নয় যথাযথ
তবু পড়ো, হাল ছেড়ো না, পড়ো
সব জানতে হবে, শুরু করো
হাল ধরতে হবে তোমায়, ধরো।

নির্বাসনের মানুষ তুমি, পড়ো
জেলখানাতে বন্দি মানুষ, পড়ো
হেঁসেলঘরের গিন্নিবান্নি, পড়ো
অবসরের বুড়ো তুমি, পড়ো
হাল ধরতে হবে তোমায়, ধরো।

ঘর নেই যার, খোঁজো তোমার স্কুল
কাঁপছ শীতে, জানো জ্ঞানের মূল
খিদেয় কাতর, ধরো তোমার বই
অস্ত্র হবে ও-ই
হাল ধরতে হবে তোমায়, ধরো।

শুধাও, কোনো ভয় কোরো না ভাই
বিশ্বাসে আর ভর কোরো না
নিজের চোখে দেখো।
নিজের থেকে শেখোনি যা
জানো না তার কিছু।
হিসেব করো পাওনাদেনা
শুধতে হবে তোমায়
সব কিছুকেই তর্জনীসংকেতে
প্রশ্ন করো কোথার থেকে এল
হাল ধরতে হবে তোমায়, ধরো।

শঙ্খ ঘোষ

(শিক্ষার গুণকীর্তন)

সোজা কথা শিখে নাও। কারণ তোমার
সময় এসে গেছে ; না হে না, দেরি হয়নি
দেরি হয় না।
তোমার অ আ'র প্রথম পড়াই শুধু নয়
ওতে কিছু হবে না কারণ ও পড়া যথেষ্ট নয়
তবু এতে তুমি তোমাকে উৎসাহহীন হতে দিয়ো না
শুরু করো। তুমি নিশ্চয় সমস্ত কিছু জানবে ; তোমাকে
জানতেই হবে। তোমাকেই বুঝে নিতে হবে নেতৃত্ব!

শিখে নাও, মানুষেরা কোন আশ্রমে কার আশ্রয়ে আছে!
শিখে নাও, তোমার ভাইয়েরা জেল হাজতে আছে।
শিখে নাও, বৌ-ঝিয়েরা রান্নাঘরে আছে।
শেখো, মানুষ, ষাট বছরের মানুষ হে!
ইস্কুল পাঠশালা খুঁজে বের করো—তোমার তো ঘরদোর নেই!
বুদ্ধিকে চোখা আর ধারালো করো—যারা কাঁপছো আতঙ্কে!
না-খেতে পাওয়া মানুষ আমার, পাঠ শিখে নাও
জানো, বই কি সাংঘাতিক অস্ত্র! তোমাকে
জানতেই হবে! তোমাকে বুঝে নিতেই হবে নেতৃত্ব!

প্রশ্ন করতে ভয় পেয়োনা, ভাই!
হেরে যেওনা, বিক্রী করো না নিজেকে; বাঁচো!
নজর রাখো নিজের ওপর; নিজে যা জানো না
জানো না; চিন্তাকে সংহত করো; মনোযোগ
তোমাকেই দিতে হবে। প্রতিটি দফায়
প্রতিটি বিষয়ে আঙুল ছুঁইয়ে স্পষ্ট বুঝে নাও
প্রশ্ন করো : কি করে এটা হলো? কেন?
তোমাকে নেতৃত্ব বুঝে নিতে হবেই।

সাগর চক্রবর্তী

(শিক্ষার প্রশস্তি)

সহজতম জিনিসগুলি শেখো। যে-তোমার
দিন আগেই এসেছে,
এখনো শেখার সময় যায় নি, কখনো যাবে না
অ-আ-ই সামান্যই,
তবু তা শেখো! তা যেন তোমায় নিরুৎসাহ না করে,
আরম্ভ কর। তোমাকে জানতেই হবে সব,
তোমাকে নিতেই হবে নেতৃত্বের ভার।

শেখো, পাগলা গারদের মানুষ।
শেখো, কয়েদী মানুষ।
শেখো, রান্নাঘরে বাড়ির বউ।

শেখো, ষাট বৎসর বয়স্ক!
যে তুমি গৃহহীন, খুঁজে বার কর তোমার পাঠশালা।
যে তুমি হি-হি ক'রে কাঁপছ, শান দাও বুদ্ধিতে!
ক্ষুধার্ত মানুষ, হাত বাড়াও বই-এর দিকে : ওটা অস্ত্র।
তোমাকে নিতেই হবে নেতৃত্বের ভার।

প্রশ্ন করতে ভয় পেয়ো না, ভাই!
মেনে নিও না সহজে,
নিজেই দেখতে হবে তোমায়!
তা তুমি জানো না
যা তুমি নিজে জানো না।

হিসাব-নিকাশ তোমারই,
দাম যা দেবার, তুমিই দেবে।
প্রতিটি পদার্থে আঙুল ঠেকাও,
প্রশ্ন কর : কী ক'রে এটা এল এখানে?
তোমাকে নিতেই হবে নেতৃত্বের ভার।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

(পাভেলের গান)

ওদের হাতে আইন, নিয়মকানুন
ওদের হাতেই প্রায়শ্চিত্ত, জেল
(না-ই বললাম পি-ডি-অ্যাক্টের কথা।)
দারোগাসাহেব জজসাহেবও হাতে।
পয়সাকড়ি কামায়   হুকুম ধরে ধামায়
বেশ তো, কী-ই বা তাতে।
ভাবছে এতেই করতে পাবে কাবু?
        ধ্বংস হয়ে যাবার আগে (খুব দেরি নেই তার)
        দেখবে ওরা কীর্তি ওদের সমস্ত চুরমার।

ওদের হাতে কাগজ, ছাপাখানা
ওদের হাতেই কণ্ঠরোধ, মার

(না-ই বললাম রাজাউজিরের কথা।)
পাণ্ডা পুরুত মাস্টারেরাও হাতে।
পয়সাকড়ি কামায়   হুকুম ধরে ধামায়
বেশ তো, কী-ই-বা তাতে।
সত্যে ওদের এতই কি ভয় তবে?
ধ্বংস হয়ে যাবার আগে (খুব দেরি নেই তার)
দেখবে ওরা কীর্তি ওদের সমস্ত চুরমার।

ওদের হাতেই গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক
মেশিনগান অথবা হাতবোমা ;
(না-ই বললাম লাঠিগদার কথা।)
সৈন্য পুলিশ সবই ওদের হাতে।
পয়সাকড়ি না পায়, তবু হুকুম ধরে ধামায়
বেশ তো, কী-ই-বা তাতে।
ভাবছে ওদের শত্রু তবে এতই শক্তি ধরে?

বলছে ওরা 'একপা দুপা এল রে ওই, এবার
থামা ওদের থামা।'
দিন আসছে, খুব দেরি নেই তার
দেখবে ওরা কোনো কিছুই লাগছে না আর কাজে
বুকভাঙা স্বর বেরিয়ে আসবে 'থামো', কিন্তু ওদের
গোলাবারুদ সোনাদানাও বাঁচাতে পারবে না।

শঙ্খ ঘোষ

ওদের আছে সংবিধান, আছে আইন-কানুন,
আছে কয়েদখানা, আছে শেকল-বাঁধন,
ওদের সমাজকল্যাণ দপ্তরগুলো নাইবা হোল গোণা-
আছে সেপাই-সাণ্ডাৎ
আছে জজ-ম্যাজিস্টার ;
টাকা পেয়ে, পয়সা পেয়ে তারা ওদের কেনা—

বেশ তো। তাতে কি?

ভাবছ বুঝি তাইতে ওরা তোমায় কিনেই নিয়েছে?
হায়! ওরা হারিয়ে যাবে এই তো সেদিন আসছে,
এই তো ওরা দেখল ব'লে এই যে এত সাজ!
এতে হ'চ্ছে না আর কাজ।
ওদের আছে খবর-কাগজ, আছে ছাপাখানা,
তাই দে' ওরা লড়াই করে, তোমার ভাষা বাক্যহীনা,
ওদের আমলা ক'টা, নাই বা হ'ল গোণা—
ওদের আছে গুরুবাবা, অধ্যাপকের আনাগোনা
প্রচুর টাকা পেয়ে তাদের কাজ হুকুম শোনা—

বেশ তো! তাতে কি?

সত্যিটাকে দেখতে ওরা এতই কি ভয় পায়?
হায়! ওরা হারিয়ে যাবে এই তো দিন গড়ায়!
এই তো ওরা দেখল ব'লে এই যে এত সাজ!
এতে হচ্ছে না আর কাজ।

ওদের আছে অনেক ট্যাঙ্ক, আছে কামান-গোলা,
আছে মেশিন-গান, আছে গ্রেনেড-বোমা,
ষ্টেন্-গান আর রাইফেলগুলো নাই-বা হ'ল গোণা—
আছে পুলিশ-পাইক, আছে সেনা, সি. আর. পি.,
অল্প টাকা পেলেও যারা ওদের গোলাম কেনা—

বেশ তো! তাতে কি?

শত্রুপক্ষ ওদের তবে এতই বেড়েছে?
ওরা জানে একদিন ওদের শেষ হবেই হবে,
আধমরাদের দল যেদিন ওদের আঘাত দেবে;
একদিন, একদিন, এই তো সে দিন আসছে;
ওরা যেদিন দেখবে এসব দিচ্ছে না আর কাজ—
গলার জোরে চেঁচিয়ে বলুক—"থামা তোরা থামা!"
তবু,
ওদের টাকা, ওদের কামান ওদের বাঁচাবে না।

রত্না বসু

(এটি সুরারোপিত গান। অনুবাদ ও রূপান্তর এখানে জড়িয়ে গেছে।)

(মায়ের আবৃত্তি)

দুজন হলে সে তো অনেক বেশি
সবাই যদি যায় তো চমৎকার
ওর অন্তত যাওয়াটা খুব চাই।

অত্যাচারের মাত্রা যখন বাড়ে
হতাশ অন্য সবাই
ওরই তখন উথলে ওঠে সাহস।

মাইনেকড়ি চাই কিংবা চায়ের জন্য জল
রাজ্যেরও চাই দখল—
ও-ই ঘটিয়ে তোলে এসব লড়াই।

জিগেস করে, ধনসম্পদ
কোথা থেকে এলে?
জিগেস করে, ধনসম্পদ
কার কী কাজে লাগো?
সব যেখানে চুপ
ও-ই সেখানে বলবে গলা খুলে
দমন পীড়ন অত্যাচারের মুখে
সবার যখন ভাগ্য নিয়ে বিলাপ
ও-ই সেখানে বলবে কার কী নাম।

সামনে নিয়ে বসে খাবার থালা
সঙ্গে বসে জ্বালা
নষ্ট গলা রুটি বা তরকারি
দুমড়ে আছে সমস্ত ঘরবাড়ি।

যত দূরেই তাড়াক ওকে
বিদ্রোহ যায় পাশে,
ওরা ওকে সরালে দেশ জুড়ে
ছড়িয়ে যাবে অশান্ত বিক্ষোভ।

শঙ্খ ঘোষ

(কম্যুনিজমের গুণকীর্তন)

এ পথটাই ঠিক, সবাই বোঝে। সহজ।
তুমিও যদি মালিক না হও ঠিক বুঝবে।
এতেই তোমার ভালো ; ব্যাপারটা সব জানো
নষ্টে একে নষ্ট বলে বোকায় বলে বোকা
এতেই বরং নষ্ট হবে বোকামি-নষ্টামি।
হুজুরেরা বলেন একে দুষ্কৃতি
আমরা জানি
এ-ই অবসান দুষ্কৃতির
পাগলামি না
এ-ই অবসান পাগলামির
সমস্যা না
এই হলো শৃঙ্খলা
সোজা, খুবই সহজ
কঠিন কেবল ঘটিয়ে তোলার দায়।

শঙ্খ ঘোষ

(মায়ের সংলাপ)

শ্রেণীশত্রুর কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করো?
শ্রমিকবিরোধী বানাও শ্রমিকদের?
তিল তিল করে আত্মবিলোপে গড়া এ সংগঠন
ধূলিসাৎ করে দেবে?
অভিজ্ঞতাও ভুলে গেছে এরা সব।
ভুলে গিয়েছে যে এক হয়ে যত দুনিয়ার মজদুর
শ্রেণীশত্রুকে রুখে দাঁড়াচ্ছে আজ।

শঙ্খ ঘোষ

(ভ্‌লাসোভার গুণকীর্তন)

এই আমাদের বন্ধু ভলাসোভা, দারুণ লড়িয়ে।
খাটতে জানেন, বুদ্ধিও খুব, নির্ভর করা চলে।
নির্ভর করি সংগ্রামে আর বুদ্ধি দেখান শত্রুদের
খাটতে জানেন বিক্ষোভে। অপরিহার্য সামান্য কাজ
খুঁটিয়ে করেন তক্ষুনি।
যেখানেই তাঁর সংগ্রাম তিনি কোনোখানে নন একলা
ওঁরই মতো খাটতে জানেন বুদ্ধিও খুব নির্ভর করা চলে
এমনি কত-না ছড়িয়ে আছেন গ্লাসগো লিঅন
সাংহাই শিকাগোতে
অথবা কলকাতায়
এ-বিপ্লবের অপরিহার্য অচেনা কত-না
যোদ্ধা!

শঙ্খ ঘোষ

(বিপ্লবী শ্রমিকদের গান)

ওঠো, পার্টির বিপদ!
তুমি তো ধুঁকছ, পার্টি যে যায়-যায়।
অবলা, তবুও তোমাকেই চাই আমরা
ওঠো পার্টির বিপদ।
আমাদের নিয়ে সংশয় করেছিলে;
আর সন্দেহ নয়, আমরা যে
এসে গেছি কিনারায়।
কটু কথা খুব বলেছিলে পার্টিকে,
আর কোনো কথা নয়, আমরা যে
ধ্বংসের কিনারায়।

ওঠো, পার্টির বিপদ।
ওঠো, চটপট ওঠো।
তুমি যে ধুঁকছ, তবু তোমাকেই চাই।

মরা চলবে না, সাহায্য করা চাই।
এড়িয়ে থেকো না, যুদ্ধে চলেছি আমরা
ওঠো পার্টির বিপদ!

শঙ্খ ঘোষ

(মায়ের আবৃত্তি)

যতদিন বাঁচো, কখনো বোলো না 'না'।
নিশ্চিত নয় যাকে নিশ্চিত ভাবো।
ঠিক একইভাবে থাকবে না কিছু আর
প্রভুদের কথা সাঙ্গ হয়েছে, আজ
প্রজাপুঞ্জের গলা তুলবার দিন।
কার এ সাহস, কে বলে 'কখনো না'?
কার দোষে এত নিপীড়ন? সে তো আমাদেরই।
কার দায় এই শাসন ধ্বংস করবার? সে তো আমাদেরই।

মার খেয়ে যারা পড়ে আছো নিচে একবার উঠে দাঁড়াও
হেরে গেছ বলে ভাবো যারা আজ আবার ঝাঁপিয়ে পড়ো
যে মানুষ তার দশ দিক জানে কে পারে ঠেকাতে তাকে
আজ নিপীড়িত কাল সে-ই হবে জয়ী
'কখনো না' থেকে করে দাও তাকে 'এখনই'।

শঙ্খ ঘোষ

(মায়ের কাছে বিপ্লবীদের গান)

গুলিতে মরেছে, ভলাসোভা, তোমার ছেলে।
দেয়ালে ঠেকিয়ে
ওরই মতো সব মানুষের হাতে গড়া।
দেয়ালে ঠেকিয়ে গুলিতে মেরেছে ওকে
ওরই মতো সব মানুষের গড়া বুলেট বা বন্দুক
উঠেছিল ওর বুকে।

ওরা ফিরে গেছে অন্য কোথাও
পালিয়ে গিয়েছে অন্য কোথাও, তবু ওর স্থির চোখে
বেঁচে ছিল ওরা নিজস্ব কীর্তিতে।
এমন কি যারা গুলি ছুঁড়েছিল তারাও
ওর চেয়ে খুব ভিন্ন তো নয়
অসম্ভব না ওদেরও শেখানো।

বন্ধুরই হাতে বানানো শিকলে, বন্ধুরই হাতে পরানো শিকলে
যেতে যেতে তবু চোখে প'ড়ে যায় ওর—
কতো ঘন হয়ে বেড়ে ওঠে কারখানা
চুল্লিতে চুল্লিতে!
তাছাড়া তখন ভোর
টেনে বার ক'রে নেবার যোগ্য সময়—
তখনো শূন্য কারখানা তবু ভরা লাগে ওর চোখে
যেন শত লোক জোগায় মদৎ
বাড়ে আরো বাড়ে লোক।

শঙ্খ ঘোষ

একটি ছোট্ট ঘুমপাড়ানি গান

(গোর্কীর "মা" উপন্যাস অবলম্বনে লেখা
"ডি মুট্টের" নাটক থেকে)

তোমাকে আমাদের দলে টেনেছি
সেটাই কি কম লড়াই?
তুমি বুঝেছ, ঝুঁকি নিয়েছ
এবং আমি যে তোমাকে আমাদের লড়ায়ে নামিয়েছি
সেটাই তো এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।
যেখানে কয়েকটি টুকিটাকি জিনিশ, যেমন
নিকার বোকার ইজের কিংবা ফুলতোলা রুমাল
অত্যন্ত জরুরী জিনিশ, সেখানে আমার সন্তান
ধরা যাক .... হারিয়ে গেল।

রুটি আর একচুমুক দুধ হ'ল জয়ের নমুনা
আর উত্তপ্ত আবাস—সে তো রীতিমত যুদ্ধজেতা।
কিন্তু তোমাকে ঐটুকু দিতে গেলে
আমাকে লড়তে হবে উদয়াস্ত।
আর তোমার একটুকরো রুটির হদিশ করতে গেলে
আমাকে পিকেটিং করতে হবে।
বড় বড় সেনাপতিরা সব যুদ্ধে জেতেন
বুক চিতিয়ে এগিয়ে যান ট্যাঙ্কের মুখোমুখি।
তবু আমিও কিছু কম লড়াই করিনি।
আর প্রথম চোটেই হাতি মেরেছি ভাণ্ডার লুটেছি
কারণ আমি একজন সাথী পেয়েছি
যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়বে আর জিতবে।

কণিষ্ক সিংহ

বেলেল্লাবাজারে

দেখুন মশাইরা, সতেরোবসন্তে আমি গেছি
বেলেল্লাবাজারে
অনেক শিখেছি সেইখানে।
মনের অনেক কষ্ট,
আর তারই তো সুযোগ আপনারা নিচ্ছেন।
নিরাশায় কেঁদেছিও কতোদিন
(বলুন, আমি তো মানুষ একটা)।
ঈশ্বরের দয়া সব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে
যত ভালোবাসা যত দুঃখ আমাদের সইবার ছিল।
কোথায় গিয়েছে সমস্ত চোখের জল গতকাল বিকেলবেলার?
কোথায় গিয়েছে তুষারের দল সব গতবছরের?

বছর যতই যায় সব সোজা হয়ে যায়
বেলেল্লাবাজারে সব সোজা।
আর আপনার দুহাত ভরতি ক'রে কত—কত কিছু।

খালি কোমলতা ক'মে যায়
অদ্ভুতভাবেই
না ভেবেচিন্তে ফেলায় ছড়ায়।
(শেষকালে সব জমা ফুরোয় যে)
তবে ঈশ্বরের দয়া সব বেশ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে
যত ভালোবাসা, দুঃখ আমাদের বইবার ছিল।
কোথায় গিয়েছে সমস্ত চোখের জল গতকাল বিকেলবেলার?
কোথায় গিয়েছে তুষারের দল সব গতবছরের?

আর হয়তো আপনার ব্যাবসাটা ভালোই শিখবেন
শিখবেন বেলেল্লাবাজারে—
লালসাবদল ক'রে খুচরো গুণে নেওয়া
ভারি শক্ত কাজ।
তবুও দেখুন, তাই তো আপনার আসে।
এখানে আপনার বয়স কমবে না কিন্তু
(বলুন, আপনি কি চিরকাল সতেরোবছর হয়ে কাটাতে পারেন?)
তবে ঈশ্বরের দয়া সব বেশ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে
যত ভালোবাসা দুঃখ আমাদের বইবার ছিল।
কোথায় গিয়েছে সমস্ত চোখের জল গতকাল বিকেলবেলার?
কোথায় গিয়েছে তুষারের দল সব গতবছরের?

('গোলমাথা ও ছুঁচলো মাথা' থেকে)
শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়

'ব্যতিক্রম' থেকে গান

গৌরচন্দ্রিকা

গায়িকা। সমাগত সুধীজনে সকলে শুনুন,
দূর পথ-যাত্রার এক কাহিনী নতুন।
তিনজন পথিকের দেব বর্ণনা,
একজন শোষক আর শোষিত দু'জনা।

ভালো করে দেখেশুনে করুন বিচার
এই সব মানুষের আচার ব্যবহার।
কূলকিনারা মেলেনা যার সেটাই তো স্বাভাবিক,
দুর্বোধ্য ঠেকলে পরেও সেটাই নিয়ম ঠিক।
খুব সামান্য ঘটনাকেও বিশ্বাস নেই তত,
এমন কি জরুরী? যা সব ঘটছে অবিরত?
নিয়ম মাফিক অনিয়মের আজব রাজত্বে,
বিধির বিধান অটুট রাখুন যে কোন শর্তে।

কুলি। (নদীর পাড়ে ইতস্ততঃ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, গান ধরে)
এই যে একটা নদী
এর পদে পদে অনেক বিপদ পার হতে চাও যদি
নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে ঐ যে দুটি লোক
একজনা চায় সাঁতার দিতে, অন্যে করে শোক
বল কে সাহসী
একজনা তো জল পেরোলেই পাবে নতুন ডাঙা
হাত-পা মুছে খানা-পিনায় করবে শরীর চাঙা
আরেক জনার পায়ের নীচে শূন্য করে ধূ-ধূ
এক বিপদের পরে নতুন বিপদ জোটে শুধু
বল বীর কে বটে
নদীর সাথে লড়ে দু'জন কাঁধ মিলিয়ে কাঁধে
তাই বলে কি হবে জয়ী দুইজনা এক সাথে?
ছি ছি তা হয় না
এ পারেতে আমি তুমি, আমরা দুটি ভাই
ও পারেতে আমি হবো ভাঙা কুলোর ছাই
বলো কেমন মজা।

সওদাগর।
শক্ত মানুষ লড়ে আর দুবেলা মানুষ মরে
কোথাও কি আর ঝর্ণা থেকে
পেট্রোলিয়ম ঝরে?
মাটি কেন বুক ফাটিয়ে সোনালী তেল দেবে
(আর) কুলি বেটা কেন আমার বোঝা ঘাড়ে নেবে
তেল চাইলেই লড়াই

মাটির সাথে কুলির সাথে সবার সাথে লড়াই
এই লড়াই-এর নিয়মটা ভাই
জলের মতো সরল
শক্ত মানুষ বেঁচে থাকে
দুবলা তোলে পটল।

সওদাগর।

মুরোদ যদি থাকে লড়াই করে যাও নইলে
লাল বাতি জ্বালো। সেটাই ভালো খুব ভালো।
শক্ত মানুষের সহায় বহু লোক দুর্বলের কেউ না লো
সেটাই ভালো খুব ভালো।
চাকর ব্যাটা কাজ করতে চাইছে না? পেছনে
টেনে লাথি মারো।
সেটাই ভালো হবে আরো
মরলে মরে যাক, হবে না খেতে দিতে
একাই খাও পোয়াবারো
সেটাই ভালো হবে আরো।
বিশ্ববিধাতার পরম করুণায় কেউ বা প্রভু কেউ দাস
আহা কি ভালো অভিলাষ
সুখীরা সুখে থাক দুঃখী-দুঃখেই
অন্ধ পাবেনা গো আলো
আহা কি ভালো, খুব ভালো।

বিচারক।

ঢিল ছুঁড়লেই পাটকেল খাবে
সবাই জানে তাই
(কেবল) বোকা ভাবে বদলে যাবে
হয়তো নিয়মটাই
দুশ্‌মন দেবে তেষ্টার জল
এমন ভালোবাসা
বুদ্ধিমানে কস্মিনকালেও
করে নাকো আশা।

গাইড।

ব্যবস্থাটা এমন মজার
বানিয়েছেন তেনারা
মনুষ্যত্ব বোধ এখানে
নিতান্ত খাপছাড়া
ভালো কাজের চেষ্টা মিছে
মরতে হবে ঠকে
গায়ে পড়ে ভাব দেখাস কেরে—
ভয় কচ্ছে তোকে
সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিলেই
সন্দেহটা বাড়ে
তেষ্টায় কার ফাটছে ছাতি
চেয়েও দেখিস নারে
নিজের কথা যে ভোলে, তার
কপাল পোড়া হায়
জল দেয় সে পরের মুখে
বাঘ ভালুকে খায়।

(সবাই মিলে)
নাটক তো ফুরোলো নটেগাছটি মুড়োলো
চোখের ওপর দেখতে পেলেন কীসের থেকে কী হ'ল।
একটা কথা বলি শেষে বিচার কোরে নিন
রোজ যা ঘটে সত্যি হবে তাই কি চিরদিন?
চিরকেলে নিয়ম দেখে রা সরে না মুখে
নিয়ম তো নয়, মিথ্যে কোরে সুযোগ নিচ্ছে লোকে
মিথ্যে বলে চেনেন যদি, একটা কিছু করুন
আপনারা সব মেয়ে পুরুষ বৃদ্ধ এবং তরুণ
একটা কিছু করুন
সবাই একটা কিছু করুন।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

জলওয়ালার গান

আমি জল বেচি।
কে আর সে জল কেনে?
সব মেহ্‌নৎ জলে গেল জল টেনে।।
চিল্লিয়ে মরি আমি—
কেনো গো আমার জল...
কেউ দেখায় না
কিচ্ছু কৌতূহল।
জল কেন তোরা, যত সব শয়তান।
কী ক'রে রুখব এই বৃষ্টির হানা?
স্বপ্নে দেখেছি সাতটি বছর টানা
বৃষ্টি নামেনি, সব চেঁচিয়ে।
আমি জল চাই, আমাকেও দয়া ক'রে...
মর তেষ্টায, যত সব শয়তান!

নান্দীকার প্রয়োজিত 'শঙ্খপুরের সুকন্যা' ('সেৎজুয়ানের ভালোমানুষ') থেকে
কথায় রূপান্তর : গৌতম চৌধুরী
সুর : কিশোর চক্রবর্তী

'ভালোমানুষ' থেকে

(পর্দার সামনে বন্ধুর গান)

জল চাইগো জল নেবে
দামটা না হয় আজকে থাকুক কাল দেবে
জল নেবে? জল নেবে?
বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ে
নয়তো অনাছুষ্টি
তবু মনের মধ্যে রাগ দুঃখু
ঝরছে যেন বিষ্টি
জল চাইগো? জল নেবে?
বিষ্টি পড়ে অঝোর ধারায় মিটলো সবার তেষ্টা।

এখন শুধু বিফল হবে জল বেচবার চেষ্টা
জল চাইগো—জল নেবে?
মনে মনে বিষ্টির রাত কী যে দারুণ ভাল—
বাইরে ঘন আঁধার বিদ্যুতেরই আলো
মেঘ গুরগুর বুকের মাঝে হুহু হাওয়ার বাজনা
মন বলে যা ঘটে ঘটুক কালকের দিন আজ না
জল চাইগো জল দেব—মা ঠাকরুণ।
মুচকি হেসে ঝাপটা হাওয়ায় গিন্নী বলেন, 'নারে'
আমি আমার পেটের খিদেয় বলি, 'এখন যারে।'
চিকণ সবুজ গাছের পাতা বিষ্টি ঝরায় টুপটাপ
জলের ওপর মেঘের ছায়া হাওয়ার দোলে চুপচাপ
জল চাইগো—জল দেব মা।
আকাশ যেন উপুড় হয়ে মেঘের বিছানায়
মাঠঘাটবন ধানের ক্ষেতে ডাকছে গভীর স্বরে
আয়রে আয় মায়ের বুকে তেষ্টা পাওয়া ছেলে—
ঊর্ধ্ব মুখে জল টানবি চুকুম চাকুম করে।
জল নেবে গো জল নেবে?
মেঘ পৃথিবীর মায়ের মতন যা কিছু দেয় এমনি
কিন্তু কেন জন্মভূমি তোমার বুকে আবার
সব মানুষই শিশুর মতন হাত বাড়ালে তেমনি
পায় না মাগো, দাম দে' কেনে, তোমার বুকের খাবার?
জল চাই গো? জল নেবে?

(পর্দার সামনে শান্তাপ্রসাদের গান)

আমি যখন মেয়ে থাকি
তখন তাঁরা আসেন
এবং মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসেন
এবং খুক্ খুক্ করে কাশেন
এবং তো তো তো তো
তোতলাতে তোতলাতে বলেন 'ভালবাসি'।

আমি যখন ছেলে থাকি
তখন তাঁরা আসেন

এবং হাত জোড় করে বসেন
এবং সন্তর্পণে কাশেন
এবং কথা শেষ হবার আগেই
বলেন 'এখন আসি।'

আমি যখন মিষ্টি হই
মিষ্টি মিষ্টি কথা কই
ভালোবাসার কথা বলি
তখন তাঁরা ঠকান
"মানে ব্যাপারটা কী জান, সবই ঠিক,
কিন্তু বাবা-মা যে"।

আমি যখন মেয়ে থাকি
তখন তাঁরা আসেন
এবং মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসেন
এবং খুক্‌ খুক্‌ করে কাশেন
এবং তো তো তো তো
তোতলাতে তোতলাতে বলেন 'ভালবাসি'।

আমি যখন কড়া হই
কড়া কড়া কথা কই
ব্যাবসা ধান্দার কথা বলি
তখন তাঁরা ঠ্যাকেন—
"স্যার কাজটা যদি একটু,
হেঁ হেঁ দয়া করে—"

আমি যখন ছেলে থাকি
তখন তাঁরা আসেন
এবং হাত জোড় করে বসেন
এবং সন্তর্পণে কাশেন
এবং কথা শেষ হবার আগেই
বলেন 'এখন আসি'।

এক দুনিয়ায় কড়া হলে
তবু কিছু পাবেন

এবং কিছু করে খাবেন
এবং মাথা তুলে যাবেন
এবং সম্মান টম্মান পাবেন কাঁড়ি কাঁড়ি।

নরম হলে সবই যাবে
প্রাণও যাবে মানও যাবে
জানও যাবে কানও যাবে
কড়া লোকে দইটি খাবে
আপনার গলায় ঝুলিয়ে দেবে হাঁড়ি
এবং চুরির দায়েও যেতে পারেন ফাঁসি।

বাঁচতে যদি চান
তবে কড়া হয়ে যান
তবে মেজাজ দ্যাখান
তবে মিষ্টিটুকু রাখুন নিজের জন্যে।

ভাল হলে ভাল হত
সেতো অন্য কথা হত
পিসীর যদি দাড়ি হত
কাকা নয় তো জ্যাঠা হত
এ কথা কি বুঝতে পারে অন্যে?
যেমন ধরুন মেধোর পিসী।

আমি যখন মেয়ে থাকি
তখন তাঁরা আসেন
এবং মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসেন
এবং খুক্‌ খুক্‌ করে কাশেন
এবং তো তো তো তো
তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বলেন 'ভালবাসি'।

আমি যখন ছেলে থাকি
তখন তাঁরা আসেন
এবং হাত জোড় করে বসেন
এবং সন্তর্পণে কাশেন

এবং কথা শেষ হবার আগেই
বলেন 'এখন আসি'।

*

একটা গল্প বলি শুনুন একটা গল্প বলি
দিনের গোড়ায় রাতটা যেমন তেমনি গল্পের গোড়া
এক দেশের এক রাজার ছিল আট আটটা ঘোড়া
একটা গল্প বলি।

সাতটা ঘোড়াই টগবগ্ ছুটতো ছিল কাজের কাজী
আট নম্বর ঘোড়া ছিল কুঁড়ে এবং পাজী
তবু রাজা বলতো তাকে তুমি সেরা ঘোড়া
যুদ্ধের কাজ দেখতে শুনতে নেইকো তোমার জোড়া।
জোর কদম! জোর কদম!! জোর কদম!!!
টগ্‌বগ টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ টগবগ্ টগবগ্ টগবগ্

ভোর হবার আগেই রাজার যুদ্ধে জেতা চাই
রাজা বাঁচলে সবাই বাঁচবে ভরসা একটাই
নয়তো জীবন যাবে............................
টগ্‌বগ টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ টগবগ্ টগ্‌বগ্

সাতটা ঘোড়াই প্রাণপণ লড়ে জীবনটুকু বাকি
আট নম্বর ঘোড়া করে যুদ্ধ তদারকি
আঁধার রাতে ঝরঝর ঝরে সাতটা ঘোড়ার রক্ত
আট নম্বর পতাকা বয় রাজার ভীষণ ভক্ত
একটা গল্প বলি।
জোরসে লড়ো! জোরসে লড়ো!! জোরসে লড়ো!!!
যুদ্ধ জেতা হলে পরে হবে কানাকানি
আট নম্বর ঘোড়া পাবে অনেক দানাপানি
সাতটা ঘোড়ার দানাপানি এক জাগাতে জড়
রাইফেল হাতে একটা ঘোড়া সাত জনার চে' বড়।।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আট নং হাতির গান

সাতটি হাতি খাটত মেজর চুঙের কারবারে,
আর আট নং-টি পেছনে চলত বরাবর,
সাতটি ছিল বুনো আর আট নং-টি পোষা
আট রাখত বাদবাকিদের ওপরে কড়া নজর।
ঠিকসে চলো ;

মেজর চুঙের কারবার—জঙ্গল,
দ্যাখো, ঠিক সব সাফসুফ চাই, আজই রাতের আগে,
হুকুম যে তাই। বুঝেছো?

সাতটি হাতি সাফ করছে বনবাদাড়,
আটের পিঠে মালিক মেজর খোদ,
আট দেখছে হুকুম তামিল হচ্ছে কিনা ঠিক,
বাকি সাতের দিকে রাখছে চোখ।
জোরসে লাগাও ;
মেজর চুঙের কারবার—জঙ্গল,
দ্যাখো, ঠিক সব সাফসুফ্ চাই, আজই রাতের আগে,
হুকুম যে তাই। বুঝেছো?
সাতটি হাতি কাজের চাপে হিম্‌সিম্,
মাটি থেকে সব ঝাঁকড়া দিয়ে উপড়ে ফেলা গাছ।
মেজর কিন্তু নয়কো মোটেই খুশ
আটেরই ঠিক মনের মতো কাজ—
হ'ল কি হে?
মেজর চুঙের কারবার—জঙ্গল,
দ্যাখো, ঠিক সব সাফ্‌সুফ চাই, আজই রাতের আগে,
হুকুম তো তাই। বুঝেছো?

সাতটি হাতি। দাঁত আর নেই একটিরও,
আট নং-টি দাঁতালো, বেশ গোলগাল।
ঝিমুনি দেখে বাকি সাত-কে গুঁতিয়ে করল সারা,
মেজর অমনি হেসেকুঁদে ওঠে একগাল—
তাড়িয়ে চলো।

মেজর চুঙের কারবার—জঙ্গল,
দ্যাখো, ঠিক সব সাফ্‌সুফ্‌ চাই, আজই রাতের আগে,
হুকুম যে তাই। বুঝেছো?

('সেৎজুয়ানের ভালোমানুষ' থেকে)
সিদ্ধেশ্বর সেন

'সেৎজুয়ানের ভালোমানুষ' থেকে

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়রা, করবেন না রাগ দয়া করে!
আমরা জানি, নাটকটাকে আরো মেরামত করা দরকার বেশ
ভেসেছে এক সোনালী উপকথা মৃদু হাওয়ার ওপরে,
থেমে গেছে হাওয়া, আর আমরা পেলাম এক বিশ্রী শেষ।
নির্ভর করে আপনাদের সম্মতিতে
আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের কাজ পাবে প্রশংসা, হায় এ কি!
আমরাও হয়েছি নিরাশ। বিস্মিত হতে হতে
পর্দা পড়ে যেতে দেখলাম আমরা, গল্প রইলো বাকি।
মানুষের স্বভাব পালটানো, অথবা পৃথিবীর? এখন কি করা যায়?
হ্যাঁ, কোনটা? তাহলে বলুন না আপনাদের মতামত?
বৃহতে বিশ্বাস রাখুন, বরং ঈশ্বরে কিংবা—কারো ওপরেই নয়?

নশ্বর হই কি করে আমরা, যারা ধনী ও সৎ?
বেরিয়ে আসার সঠিক পথ চরম দুর্দশা থেকে
অবশ্যই নিজের পাবেন খুঁজে। বন্ধুগণ, দেখুন ভেবে,
মানুষের সাথে মানুষ কি করে থাকতে পারে বন্ধুভাব রেখে
কিভাবে ভালো মানুষ—মানুষীরাও—ভালো সমাপ্তিতে পৌঁছোবে।
নিশ্চয়ই 'কোনো না কোনো' সঠিক সমাপ্তি আছে, নিশ্চয়ই আছে
ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়রা, ব্যাপারটা সমাধান করতে সাহায্য দরকার
আপনাদের কাছে।

সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃদ্ধ ।। আমাব আশা ছিল মনে যখন যৈবন ছিল টাটকা
আমি ভেবেছিলাম বুদ্ধি দিয়ে জিতব জীবন ফাটকা।
কিন্তু ক্ষুধার জাঁতাকলে বুদ্ধি পড়ে গেল আটকা,
এখন আমি বুড়ো গরু, না ঘরকা না ঘাটকা।

তাইতো বলি, চুলোয় যাক সব কলকেতে দাও টান
ধোঁয়ায় ধোঁয়াব ভরিয়ে দাও, সব মুশকিল আসান।
কোরাস ।। সব ধোঁয়া—সব ধোঁয়া।
মধ্যবয়স্ক ।। আমি সোজাপথে চলতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ি
আবার চোবাপথে চলতে গিয়ে গোলোক ধাধাঁয় ঘুবে মরি।
যে পথ বেছেই নাও না কেন, সোজা কিংবা বাঁকা
মোদ্দা ফলটা শূন্য যে হায়, কপালে সব ফাঁকা।
তাইতো বলি, চুলোয় যাক সব কলকেতে দাও টান
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরিয়ে দাও, সব মুশকিল আসান।
কোরাস ।। সব ধোঁয়া—সব ধোঁয়া।
যুবক ।। তোমরা যে সব বুড়োরই দল বাতিল হলে ভবেব হাটে
বিকোবে না কোন দামেই, উঠবে এবার খাটে।
আমরা নবীন, ভবিষ্যৎটা আমাদেবই বলে জানি,
যদিও সেখানে জমা আছে শুধু হতাশা আব গ্লানি।

‘ভালোমানুষের পালা’ (সেৎজুয়ানের ভালোমানুষ) থেকে
গানটির রূপান্তর ও সুর : অরুণ মুখোপাধ্যায়।

সেদিন কি আর আসবে?

ঐ ঝিয়ের ছেলে সোনার থালায় খাচ্ছে বসে ভাত,
আব শয়তানদের ধরে ধরে মারছে সবাই লাথ।
বল দিকিনি, বল দিকিনি আসবে সেদিন কবে?

যে-মাসেতে রবিবার নেই সেই মাসেতে হবে।
সেদিন থাকবে আকাশ নিচুর দিকে
ঘাসের ডগা ওপর থেকে হাতছানি দে’ ডাকবে,
সেদিন নুড়িগুলো ঝরণা বেয়ে
ওপর দিকে উঠে যেতে থাকবে।

সেদিন পৃথিবীটা মধুমাখা,
ক্ষীর-ননী আর দুধ-ঘি-সরে ভাসবে।
বল দিকিনি আসবে সেদিন কবে, তোর মাথায় কিছু আসে?
যেদিন সূর্য উঠবে পশ্চিমে আর অস্ত যাবে পুবের আকাশে।
সেদিন শয়তানেরা শাস্তি পাবে
ভালমানুষকে বুকে টেনে সবাই ভালবাসবে।
সেদিন কি আব আসবে?

আসে যদি দেখো সেদিন
নয়নতাবাও চন্দন পবে কনে বউটি সাজবে
সেদিন কি আব আসবে রে ভাই, সেদিন কি আর আসবে!
আসে যদি দেখো সেদিন
অনিল সেনও প্লেনে চড়ে মেঘেব কোলে ভাসবে।
সেদিন কি আর আসবে রে ভাই, সেদিন কি আব আসবে।

[চেতনা প্রযোজিত 'ভালোমানুষের পালা' (সেৎজুযানেব ভালোমানুষ) থেকে
গানটির ভাষান্তব ও সুর : অরুণ মুখোপাধ্যায।
'চেতনা' প্রযোজনায গানটি 'কবির লড়াই' এব মত ক'রে পবিবেশিত হ'ত।]

সবুজ পনিরের গান

হাঘবেরা দিন গুনছে, আসবে এমনি দিন যখন ছোটলোকেব
বাচ্চা পাবে এই দুনিয়াব চাবি আব চাঁদের বুড়ি তৈরী হবে
ক্ষীব মধু দিযে তখন ভালো পাবে ভাবি ইনাম, শাস্তি পাবে পাজি
ফারাক কিছু বইবে না, স্রেফ যোগ্যতা মাপকাঠি
যখন চাঁদেব বুড়ি........
(যখন) ঘাসেরা সব চোখ নামিযে আকাশ দেখবে নিচে
আর নুড়িগুলো উঠবে নদীর স্রোতের ধারা ঠেলে
আহা মানুষ হবে রাজা, মুফত গিলবে ননী মধু
যখন চাঁদের বুড়ি......
(তখন) আবার আমি প্লেন চালাব তুমিও সহকারী
(পাবে) সব হাবানো মানুষ তুমি পাবেই বাঁচার মানে
যখন চাঁদের বুড়ি......

নান্দীকার প্রযোজিত 'শঙ্খপুরের সুকন্যা' ('সেৎজুয়ানের ভালোমানুষ') থেকে
কথায় রূপান্তর : গৌতম চৌধুরী সুর : কিশোর চক্রবর্তী

বীরাঙ্গনা মাতার গান

যদি তাকৎ তোমার থাকে কমতি
তবে পারবে না জয়ের মুখ দেখতে ;
যুদ্ধ সে একটা ব্যবসাই
মাখনের বদলে ছুরি-গুলিতে।

এসেছে বসন্ত, খেরেস্তানী জাগো।
বরফ গলছে, মৃতরা শুয়ে,
আর, যা কিছু এখনো মরণ-ফাঁদে পড়েনি
বিড়বিড় করছে তারাই, পেছনের পায়ে, লাফিয়ে।

উল্‌ম থেকে মেৎজ, মেৎজ থেকে মোরাভিয়া
বীরাঙ্গনা মাতা সব ঘাটেই ঘুরছে,
লড়াইটা জানে তার সাকরেদের কারবার
দেওয়া চাই যোগান গোলাগুলি আর বারুদের,
আর, বারুদই নয়, সেই সঙ্গে লোকলস্কর লড়বার।
তাই আজই যাও, নাম লেখাও ফৌজে,
আর আজই যাও, নাম দাও তোফা মৌজে।

দেখেছ জ্ঞানী সোলোমন,
হল তার কী হাল!
মানুষটার ছিল নজর
বেজায় পরিষ্কার ;
তবু সেই যে অমন জ্ঞানী,
রাত না হতে কাবার
জগতের লোক দেখল
জ্ঞানই হল তার কাল।

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে, ভাই,
নেইক' যার এইসব বিবেকের বালাই।

দেখেছ বীর সীজার,
শেষটা হল কী হাল!

ছিল ঈশ্বরের মতো পোক্ত
তখ্ত-তাউস তার ;
তবু উঠল যখন তুঙ্গে
তখনই পড়ে কাবার,
জগতের লোকে দেখল
দম্ভই তার কাল।

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে, ভাই,
নেইক' যার এইসব তেজের বালাই।

দেখেছ সাধু সোক্রাতিস
হল তার কী হাল।
মানুষটা ছিল সত্যের
আর সততার আধার,
তবু শাসকরা তাকে করলো
হেমলক-বিষে কাবার।
জগতের লোকে দেখল
সত্য হল তার কাল!

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে, ভাই,
নেইক' যার এইসব সততার বালাই।

দেখেছ সে সব আস্তিক,
দশ-অনুজ্ঞার দাস ;
তাতে কী হল জগতের
ধর্মাধর্মের নিকেশ ;
আমরা বটে ধার্মিক
তবু রাত না হতেই শেষ,
ঈশ্বরের ত্রাস,
আমাদের নিয়ে এল কোথায়!

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে, ভাই,
নেইক' যার এইসব আস্তিক্যের বালাই।

আহারে, আহা,
খড়ের গাদায় কী খস্‌খস করে?
প্রতিবেশীর ছেলেটা ফোঁপায়,
আমারটি তো বেশ
নেচে কুঁদেই বাড়ে।
থাক না,
প্রতিবেশীর কোমরে ত্যানা,
আমার পরনে তো সিল্কের জোব্বা,
খাস দেবদূতের কাছ থেকেই
আনা।

প্রতিবেশীর সানকিটা শূন্য,
হোক না আমারটাতে তো পরমান্ন।
যদি তাতে মনে লাগে ভায়া,
কোরো একটু, উহু, আহা-আহা।
খড়ের গাদায় কী খসখস্‌ করে?
একটা তো জমি নিল পোল্যাণ্ডে,
আর একটা উজবুক কোন রাজ্যে মরে।
সব ভালো সব মন্দের শেষে
যুদ্ধটা ঠিক চলেছেই কায়ক্লেশে,
একশ' বছর চলবে নাকি এ লড়াই?

মানুষজন যে হল আকালের বলি,
সেনারা না পায় মাইনে, শূন্য থলি,
কত্তারা সব বামাল করছে চুরি।
যদি বা আবার কপাল ফেরে আখিরি
যুদ্ধটা আজও চলেছে নেহাৎ-ই, তাই :

এসেছে বসন্ত খেরেস্তানী জাগো!
বরফ গলছে, মৃতরা শুয়ে,
আর, যা কিছু এখনো মরণ ফাঁদে পড়েনি,
বিড়বিড় কবছে তারাই, পিছনের পায়ে লাফিয়ে।।

('সাহসী মা ও তাঁর সন্তানেরা' থেকে)
সিদ্ধেশ্বর সেন

শ্‌ভাইক্‌ থেকে

নাৎসী বৌ-এর গান

সৈনিক বধূর তরে কী এল আজকে ডাকে?
প্রাচীন শহর প্রাগের কী উপহার?
পাঠিয়েছে প্রাগ উঁচু-খুর-অলা জুতো,
সঙ্গে এসেছে চিঠিও এবং জুতো।
এই পেল বধূ তবে প্রাগ থেকে উপহার।

কী পাঠালো স্বামী রটারডামের থেকে?
বড়লোকেদের শহর রটারডাম।
স্বামী পাঠিয়েছে রটারডামের টুপি—
ছোট্ট টুপিটি দেখতে মিষ্টি ভারি।
এই পেল নারী তবে রটারডামের ডাকে।

থেকে কী বা এল উপহার?
প্যারিস শহরে ঝলমল করে আলো।
প্যারিসের থেকে পেল সে রেশমী জামা—
এই জামা দেখে মুগ্ধ হবে যে লোকে।
আলোর শহর প্যারিস পাঠালো তাকে।

সৈনিক বধূ এবার কী পেল ডাকে?
তুষার ধবল রাশিয়া পাঠাল কী বা?
রাশিয়া পাঠায় বিধবার কালো বেশ—
এইটুকুই তো আজ তার দরকার।
রাশিয়া পাঠালো ঠিক সেই উপহার।

হেনরীর বৌ-এর গান

নতুন বৌ-এর পাশে হেনরী ছিল শুয়ে।
বৌ ছিল তার রাইন পারের জমিদারের মেয়ে।
আকাশে ছিল চাঁদ, রাত নিঃঝুম,
নতুন বৌ-এর পাশে হেনরীর চোখে নেইকো ঘুম।

রাত বারোটা বাজতে জানলার পর্দা গেল সরে,
বিছানাতে হেনরী অমনি উঠলো নড়েচড়ে—
বিয়ের আগের প্রেমিকা সে জানলা থেকে ডাকে,
কাকে রাখবে হেনরী বলো ফেলবে এখন কাকে?
আকাশে ছিল চাঁদ, রাত নিঃঝুম।
ঘরে বৌ, বাইরে প্রেমিকা, হেনরীর চোখে নেইকো ঘুম।

জার্মান সৈন্যদের গান

একদিন মহানেতা বললেন—
ওঠো, জাগো, জার্মানী ওঠো!
ডানজিগ শহরটা চাই
তাই পোল্যাণ্ডটা নিয়ে নাও, ভাই।
ট্যাঙ্ক এল, এসে গেল বোমারু—
দুটি সপ্তাহ মোটে লাগল—
তারি মাঝে পোল্যাণ্ড হজম।
নেব বলে নিয়ে নিল ঠিকই—নিল তো!

একদিন মহানেতা বললেন—
ওঠো, জাগো, জার্মানী ওঠো!
ফ্রান্স নাও, নরওয়েও নিয়ে নাও।
ট্যাঙ্ক এল, এসে গেল বোমারু—
পাঁচ সপ্তাহ মোটে লাগল—
করতলে নরওয়ে ও ফ্রান্স।
নেব বলে নিয়ে নিল ঠিকই—নিল তো!

শ্‌ভাইকের গান

ভেবেছিলাম যুদ্ধে যদি যাই
নাচ গান আর হল্লা হবে জোর
যুদ্ধটাতো দু-তিন হপ্তার মামলা
তার পরে তো ছুটি মিলবে মোর।

বোকা ভেড়ার গান

বাজনদারের পেছন পেছন ভেড়ার পাল চলে
ভেড়ার চামড়ায় ড্রাম তৈরী, ভেড়াকে কে বলে?
সে কথাটা ভেড়াকে কে বলে?
জল্লাদ ডাকছে যে ভেড়াদের—কোথা যাবে জানে না।
শিং নেড়ে কান নেড়ে ছুটে যায়, দিব্যি দোহাই মানে না।
ওদের আগের যত ভেড়া কচুকাটা কসাইখানায়।
দেহহীন ভেড়াদের আত্মা মার্চ করে চলে যায়।
ভেড়াকে কে বলে? সে কথাটা ভেড়াকে কে বলে?
রক্তমাখা রণপতাকায় পবিত্র ক্রস বাঁধা—
ঐ দিয়ে তো গরীব ঠেঙায় জানে সকল গাধা।
ভেড়াকে কে বলে—সে কথাটা ভেড়াকে কে বলে।

চ্যালিসের গান

ঢুকে পড়, এই চ্যালিসেই ঢুকে পড়।
আমাদের এই টেবিলটায় বসে পড়।
মোলডাউ নদীর টাটকা মাছের ভাজা ও ঝোল
দিয়ে যাব যত তুমি খেতে পার।
একদিন তো আসবে যেদিন আকাশ মাটি
রোদ্দুর আর জলের কথা বলবে সবাই।
দুনিয়াটাই হবে সেদিন মস্ত চ্যালিস।
মালকিন নয়, খদ্দের নয়, সব ভাই ভাই।
সেদিন সবাই ভেতরে কেউ বাইরে না।
গান চলবে তাইরে নাইরে নারে নাইরে না।
পান কোরো ভাই গোটা সেলার,
পকেটে খুচরো রেখো আশী হেলার।

শ্‌ভাইকের গান

তুমি থাকতেও পারছ না, তুমি যেতেও পারছ না।
তোমার ওপর দিকটা পচা, তোমার নিচের দিকটা গলা।
পুব আকাশে লাল ফৌজের মাথার ঝুঁটি লাল—
রাশিয়ার প্রান্তরে তোমার বন্ধ হোল চলা।
এবার ভাবছি তোমায় নিয়ে করবটা কী?

শিসের গুলির ঝাঁঝরা করব—নাকি,
পাতলুন খুলে ছড়াব বিষ্ঠা তোমার মাথায়।

মোলডাউ নদীর গান

সময়টাতো পাল্টে যাচ্ছে, যেতেই হবে।
শাসন যারা করছে তাদের সব কুচক্র ব্যর্থ হবে।
রক্তলোভী মোরগ যেমন এরাও তেমনি ঝুঁটি নাড়ছে।
কিন্তু গায়ের জোরে তো সব হবে না—
সময়টাতো পাল্টে যাচ্ছে।
মোলডাউ নদীর তলায় পাথর নড়ে যাচ্ছে।
প্রাগ শহরের মাটির ধুলোয়
তিন সম্রাট ধুলো হচ্ছে।
নিচুটা যে উঠে আসছে—
উঁচু তাই আর উঁচুতে থাকবে না।
বারো ঘণ্টা রাতের ভাগে
তারপরে তো দিন আসছে, দিন আসছে।

ভাষান্তর : অশোক মুখোপাধ্যায়

উপহার

(বের্টোল্ট ব্রেখ্ট অবলম্বনে)

সৈনিক বধূ অবাক, খুলল মোড়া,
নজর পাঠায় প্রাচীন শহর প্রাগ্।
উঁচু খুর-ওলা জুতো এ যে এক জোড়া-
অবাক করলে পুরানো শহর প্রাগ্!

সৈনিক বধূ মোড়া খোলে চুপি চুপি
সাগর পারের অস্‌লো পাঠালো কিবা?
পাঠিয়েছি স্বামী সরেশ লোমের টুপি—
ফুর্তিতে হাসে আর্য শিবের শিবা।

সৈনিক বধূ অবাক নয়নে দেখে,
এমস্টারডাম পয়সার দেশ বটে,

হীরার আংটি পাঠাল সেখান থেকে—
শাদা চামড়ায় মানাবে তা বেশ বটে।

সৈনিক বধূ অবাক হয়েই থাকে,
ব্রাসেলস শহর বড়োই সে শৌখিন!
দামী দামী লেস্ ব্রাসেল্‌স পাঠায় ডাকে—
কিবা সাজগোজ চলবে সারাটা দিন!

সৈনিক বধূ বিস্মিত, ভাবে বামা,
প্যারিসের আলো চক্ষু জ্বালায় তার
ফ্যাশন স্বর্গ পাঠাল রেশমী জামা—
চরম এ শখ জেগেছে কত না বার!

সৈনিক বধূ সুখে ভাবে চোখ বুজে
বুখারেস্ট থেকে ব্লাউস যে উপহার,
পাঠায় আবার স্বামী তার খুঁজে খুঁজে
নকশার কাজ, রঙের কি যে বাহার!

নাৎসির বৌ আবার অবাক চেয়ে—
তুষার কঠিন রাশিয়ার উপহার!
বিধবার কালো ঘোমটা পাঠাল কে এ
তুষার কঠিন রাশিয়ার উপহার!

('শ্‌ভাইক' থেকে)
বিষ্ণু দে

('খড়ির গণ্ডি' থেকে)

(নবাববাড়ি)

গায়ক — সে অনেক বছর আগের কথা
বল না হে
ঠিক মনে নাই—
তা হবে চার-পাঁচশো সাল
তা হবে
হবে

এই বাংলাদেশের আকাশ জুড়ে সিঁদুরে মেঘ লাল।
সারা দেশের মালিক তখন জাফরখাঁ সুলতান
আর ছোট বড় নবাবেরা পরগণা চালান।
দৌলতপুর পরগণাতেও
এক যে ছিলেন নবাব
মন্দ তাঁকে বলত তারা
কারা হে? কারা?
যাদের নিন্দে করা স্বভাব
ছি ছি ছি
তাদের মুখে যুগে যুগে পড়ুক চুন আর কালি
তাদের মুখে যুগে যুগে পড়ুক চুন আর কালি
দৌলতপুরের রাজ্য চালান
নবাব আব্বাস আলি
নবাব আব্বাস আলি
ধনরত্নে সিন্দুক বোঝাই বেগম জ্যান্ত পরী
ফুটফুটে তাঁর ছেলের মুখে চাঁদের গড়াগড়ি
চাঁদের গড়াগড়ি (কোরাস)
অন্য কোন জায়গীরদার গৌড় পাণ্ডুতে
পাল্লা দিয়ে পারবেন না তাঁর তিন সীমানা ছুঁতে
আস্তাবলে হাজার ঘোড়া, রাস্তাতে ভিখারী
লোকলস্কর, লেঠেল, পাইক, কামান-বন্দুকধারী
হায় হায় কামান-বন্দুকধারী
দরবারে তাঁর আর্জিহাতে উমেদারের সারি
দৌলতপুরের রাজ্য চালান নবাব আব্বাস আলি
. নবাব আব্বাস আলি
কেমনে বর্ণিব আমি, তাঁহার গুণগান
কেমন বর্ণিব আমি, তাঁহার গুণগান (কোরাস)
ঠেকায় কেডা
সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ সবই, পূর্ণ ধনমান
তারপর তারপর
এমতকালে একদিন ইদের মোনাজাতে
নবাব এলেন মসজিদে, বেগম এলেন সাথে
নবাব এলেন, বেগম এলেন সাথে।

(সাঁকো)

(ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ)

লুৎফা। (গান) সোনা সোনা কেউ যে তোকে চায় না
কেউ তোকে নাই নিক, আমার কোলে আয়না
তোকে দেব দুধ ননী, কোথায় গ্যালো রাখাল
জন্মে বাপু দেখিনি এমনতরো আকাল
একসের দুধের দাম পাক্কা তিনটি মোহর
হাঁটতে হাঁটতে ছাড়িয়ে এলাম কত গ্রাম-শহব
পায়ে ফুটেছে কাঁটা শরীরও আর বয়না

পায়ে ফুটেছে কাঁটা শরীরও আর বয়না
তোকে ছেড়ে দু'দণ্ডও মন যে আমার রয়না,
তোর এই রেশমী জামা এবার ফেলে দেবো ছুঁড়ে
কাঁথার মধ্যে লুকিয়ে তোকে যাবো আরো দূরে
নদীব জলে তারপর ধুইয়ে দেব গা'টা
তুমি কিন্তু কেঁদো না, ও আমার সোনাটা।

গায়কবৃন্দ। বাচ্চাটাকে কেড়ে নিলো কালোকুর্তারা
বাচ্চা ভীষণ দামী।
দুঃখী মেয়ে পিছু পিছু চলল শহরে
জায়গা খুব হারামী।
আসল মা চাইল ফিবে কোলের ছেলে তার
এখন বিচার হবে।
ধাইমা দাঁড়ায় কাঠগড়াতে বক্ষ দুরু দুরু
বাচ্চা কোন মা পাবে!
হাকিম হবে কেমন মানুষ, ঘুষখোর না খাঁটি—
জানেন আল্লাতালা।
শহর জুড়ে জ্বলছে আগুন, মুস্তাক হল হাকিম
এবার দেখুন পালা।

(মুস্তাকের বাড়ি)

গায়ক। এবার শুনুন এক হাকিমের গল্প—
কীভাবে সে বসেছিল বিচারের আসনে

কেমন সে রায় দিল কতখানি ভাষণে।
এবার শুনুন সেইসব গল্প
বিদ্রোহ হয়েছিল সেই যে ইদের দিন সকালে
মসনদ হারালেন সুলতান
আর দৌলতপুরের নবাব, বুলবুল সাহেবের বাপ
গর্দান হারালেন অকালে
সেই দিনেতে পাড়াগাঁয়ের কেরানী মুস্তাক
বনের পথে পালিয়ে চলা- এক বুড়োকে দেখে
রাখলো তাকে কুঁড়েয় এনে জানলো না যে সে কে
এবার শুনুন সেই সব গপ্পো—

মুস্তাক। ঠাকুমা গো ঠাকুমা
তুমিই আমার বাংলাদেশ তুমিই আমার বাংলা মা
শণের মত উড়ছে চুল মুখে তোমার কত দাগ
মুর্গী চুরির বদনামেতে সারা দেহে ফুঁসছে রাগ
ধানের ভাগ চাইতে এলে বাঘের মতো লড়ে যাও
কুর্শিতে কেউ বসতে বললে শিশুর মতো ভয় পাও
একটিবার একটিবার
ওগো আমার ঠাকুমা ওগো আমার বাংলা মা
একটিবার জ্বলে উঠে দাওনা একটা রায়
চারপাশে যা ঘটতে দেখি যেন উল্টে যায়।

গায়কবৃন্দ। এম্নিভাবে আইন কানুন রুটির মতো ছিঁড়ে
হরির লুঠ বিলিয়ে দিল হাঘরেদের ভীড়ে,
ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না সে, দিব্যি নিত ঘুষ
তবু তার পিঠেতেই এলিয়ে বসে হাভাতে সব মানুষ
এম্নিভাবে তিনটি বছর আশার প্রদীপ জ্বেলে
গরীব লোকের হাকিম ছিল গরীব ঘরের ছেলে
মাথার ওপর ফাঁসির দড়ি, কাজীর পোষাক গায়ে
মুস্তাক আলি বিচার করে আপরুচি কায়দায়।

গান। সারা বছর রক্তে ঘামে
ফসল ফলাই অনেক দামে
মহাজনের লেঠেল পাইক যতই করুক ধাওয়া
এবার গোলায় তুলছি সে ধান

মাথায় ছুঁয়ে মাটির এ দান
সবাই মিলে নবান্নেতে খুশির এ গান গাওয়া।

(গানটি গাইতে গাইতে লুৎফা, বুলবুলের সঙ্গে সমস্ত জনতা মঞ্চে নাচতে থাকে। এরই মধ্যে মুস্তাক কোন এক সময় প্রস্থান করে, কেউ তাকে দেখতে পায় না। গায়কবৃন্দ প্রবেশ করে)

গায়ক। মুস্তাক গেল কোথায় হারিয়ে সেই সন্ধের পর
কেউ কোনদিন হদিশ পায়নি তার
যাঁরা শুনলেন এই গণ্ডির বৃত্তান্ত
মনে রাখবেন এই গপ্পের সাধাসিধে সিদ্ধান্ত
যে-কোন জিনিষ হাতে পাবে সেই,
যোগ্যতা আছে যার
গাড়ি যাবে ভালো চালকের হাতে
ছুটবে সে জোরদার
শিশুকে দেখবে স্নেহময়ী নারী বড় হয়ে ওঠে যাতে
ফসল ফলাবে যারা ক্ষেতমাঠ যাবে সেই চাষীর হাতে।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত